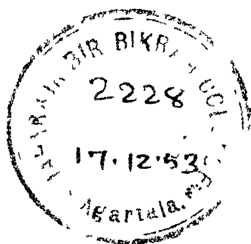
দুর্ঘটনা

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র



মিত্র ও ঘোষ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা

দ্বিতীয় সংস্করণ

—দুই টাকা বারো আনা—

শ্রীশৈল চক্রবর্ত্তী
কর্ত্তৃক চিত্রিত

মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীসুমথনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক
প্রকাশিত, দত্ত প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, ২৪, বাগমারী রোড, কলিকাতা হইতে
শ্রীবিভূতিভূষণ পাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ

শ্রীমতী সুরমা মিত্র

পূজনীয়া বৌদিদির করকমলে—

বন্ধুরা অনেকদিন হইতে অনুরোধ করিতেছিলেন, অপেক্ষাকৃত হাল্‌কা রসের গল্পগুলি একত্রে গাঁথিয়া প্রকাশ করিতে। তাঁহাদের সে অনুরোধ রক্ষা করিতে গিয়া একেবারে কৈশোরের রচনাও দুই-তিনটিকে ইহার মধ্যে স্থান দিতে হইল। হয়ত তাহাতে কাঁচা হাতের ছাপ কিছু-কিছু আছে কিন্তু তবু স্বাভাবিক মমতাবশে তাহাদের একেবারে বর্জ্জন করিতে পারি নাই, একই ধারার গল্প হিসাবে এই সংকলনে তাহাদের খুব বেমানান্ দেখাইবে না, এই ভরসাতে তাহাদের এইসূত্রে গাঁথিয়া দিলাম। আশা করি এ অপরাধ পাঠকেরা ক্ষমা করিবেন।

—এই লেখকের—

স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম্
মনে ছিল আশা
রজনী গন্ধা
পুরুষ ও রমণী
ভাড়াটে বাড়ী
কোলাহল
নববধূ
প্রভাত সূর্য্য
বহু বিচিত্র
স্বর্ণ মুকুর
নব যৌবন
পৃথিবীর ইতিহাস

দুর্ঘটনা

সেভ্‌ন্ আপ দিল্লী এক্সপ্রেস—ডাকনাম যাহার তুফান মেল—তাহারই একখানা থার্ডক্লাস কামরায় আমাদের নাটকের আরম্ভ এবং সেইখানেই যবনিকা।

গাড়ীতে সেদিন কি কারণে জানিনা, অসম্ভব ভিড় হইয়াছিল। ভারতবর্ষের প্রায় সব প্রদেশেরই কিছু-কিছু লোক হরেক রকমের মোটঘাট লইয়া কামরাগুলিকে একেবারে ভরাইয়া তুলিয়াছিলেন এবং প্রবেশপথের অবস্থা চক্রব্যূহের অপেক্ষাও দুর্ভেদ্য হইয়া উঠিয়াছিল। সেই অবস্থার মধ্যেও শেষ-মুহূর্তে একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক যখন সকলকে ঠেলিয়া ঠুলিয়া, সকলের তারস্বর প্রতিবাদে কর্ণপাত মাত্র না করিয়া উঠিয়া পড়িলেন, তখন যে আমরা সকলেই বিরক্ত হইয়াছিলাম তাহা বলাই বাহুল্য।

ভদ্রলোকের সুবিধার মধ্যে সঙ্গে মোটঘাট বিশেষ ছিল না, একটি স্যুটকেস মাত্র হাতে করিয়া তিনি উঠিলেন, কিন্তু বাঙ্ক্ বা মেঝে কোথাও ব্যাগটি রাখিবার তিলমাত্র স্থান না দেখিয়া হাতে করিয়াই দাঁড়াইয়া রহিলেন এবং চারিদিকের মিলিত ক্রুদ্ধ দৃষ্টির মধ্যে অবিচলিত-ভাবে দাঁড়াইয়া চাদরের খুঁটে ঘাম মুছিতে লাগিলেন।

ট্রেণ ছাড়িবার অল্প কিছুক্ষণ পরেই সহসা তাঁহার নজরে পড়িল ওধারে একটি ভদ্রলোক জানলার উপর হাত রাখিয়া কনুইটি বাহির করিয়া বসিয়া আছেন। তিনি যেন ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন, ও মশাই! শুন্‌ছেন, ও দাদা—দয়া ক'রে কনুইটা ভেতরে টেনে নিন, আমি হাত জোড় করছি!



দয়া ক'রে কন্নুইটা ভেতরে টেনে নিন, আমি হাত জোড় করছি।

কন্নুই-এর মালিক হাত ভিতরে টানিয়া লইলেন বটে, কিন্তু অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া ভদ্রলোকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। উপস্থিত অন্য সকলেরও প্রায় সেই অবস্থা, তাঁহার ব্যাকুলতা কিন্তু হাত টানিয়া লওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চলিয়া গিয়াছিল, তিনি অতঃপর

ধীরে সুস্থে আমাদের দিকে চাহিয়া কারণটা বিবৃত করিলেন, এখনও পাঁচটি দিন হয়নি মশাই ওয়ালটেয়ার থেকে আসছিলুম মাদ্রাজ মেলে, এক ভদ্রলোক অমনি কনুই বার ক'রে বসেছিলেন, দেখতে দেখতে মশাই—আমার চোখের সামনে—হাতখানি তিন টুক্‌রো! কনুইটি রইল বাইরে, বগল আর হাত ভেতরে চ'লে এল।

চারিদিক হইতে একটা বিস্ময়ের গুঞ্জন উঠিল। যিনি কনুই বাহির করিয়া বসিয়াছিলেন, তাঁহার ত রীতিমত মুখ শুকাইয়া গেল।

---বলেন কি মশাই?

---আজ্ঞে, তবে আর অত ব্যস্ত হলুম কেন বলুন।

ওধারের বেঞ্চ হইতে একটি মাড়োয়ারী যুবক বলিয়া উঠিল, লেকিন্ কাহেসে কাটা বাবুজী?

ভদ্রলোক একটু যেন উষ্ণভাবেই কহিলেন, এটা আব সমঝা নেহি? পাথর! পাথর! পাহাড়কা উপরসে পাথর গিরা!

ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করিলাম, বলেন কি মশাই?...পাহাড়ের ওপর থেকে পাথর প'ড়ে বেচারার হাতটা কেটে গেল?

—যাবে না? সে কি যা তা পাথর? অন্ততঃ তিনটি মণ ওজন হবে!

একজন দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, ট্রেণে জার্নি করা প্রাণ হাতে ক'রে।

—কিচ্ছু বিশ্বাস নেই মশাই, বুঝলেন। যতক্ষণ না ফিরে আসছেন ততক্ষণ বিশ্বাস নেই।...এইত মাস-খানেকের কথা, দানাপুর স্টেশনে গাড়ী থেমেছে, আমাদের ম্যাক্‌নীল কোম্পানীর হরেনবাবু স্টলে গেছেন চা খেতে; খেয়ে আসতে, আসতে আসতেই গাড়ীটা দিয়েছে ছেড়ে।

ও মশাই, সামান্য স্পীড, কিন্তু ভদ্রলোক একটুখানি পা পিছ্‌লে যেমন গলে প'ড়ে গেলেন আর অমনি দু' টুকরো।

আবারও সেই অস্ফুট গুঞ্জন! অনেকেরই মুখ শুকাইয়া উঠিল, বোধহয় নিজেদের ইতিপূর্ব্বেকার চলন্ত ট্রেণে উঠিবার ইতিহাস স্মরণ করিয়া। বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি তাঁহার যুবক সঙ্গীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হাতরাস থেকে মথুরার ট্রেণ ধরে কাজ নেই, ববং বাসে গেলেই হবে।

আমাদের নবাগত ভদ্রলোকটি আরও যেন তাতিয়া উঠিলেন, বাস? ও আরও ডেঞ্জারাস্? শুনবেন তাহ'লে বাসেব কথা? আমার এক মাস্টার মশাই আসছিলেন তমলুক থেকে বাসে ক'বে—পাঁশকুড়োয ট্রেণ ধরবার জন্যে, হঠাৎ মোড় ঘুরেই দেখা গেল, রাস্তার ওপর গোটাতিনেক ছাগল ছানা দাঁড়িয়ে আছে, তাদের বাঁচাবার জন্য ড্রাইভার যেমন পাশ কাটাতে গেছে, একেবারে উঁচু বাস্তার ওপর থেকে গড়াতে গডাতে বাসসুদ্ধ চলে গেল নীচের জমিতে। সতের জন প্যাসেঞ্জারেব মধ্যে তিনজন তখনই মারা গেল, আর দু'জন হাসপাতালে পৌছেই গেল, বাকী সকলকে মাস-ছয়েক ক'রে ঝোল-ভাত খেতে হ'ল। শুধু ড্রাইভাব ভাল ছিল, তার কিছু হয়নি।

শ্রোতাদের মধ্যে অনেকেরই এই বর্ণনায গা-মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। আমার ত রীতিমত পেট ব্যথা করিতে শুরু করিয়াছে। কিছুক্ষণ পরে প্রথম ভয়ের ব্যাপারটা কাটিতে আমাদের বিরাজবাবু সেই মথুরাযাত্রী বৃদ্ধটিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ও বাসে ফাসে কখনও চড়তে নেই মশাই, ভারী বিপজ্জনক! যদি নিজের মোটর থাকে, কিম্বা ট্যাক্সী—

—তাতেই বা কি সুবিধে মশাই? সেদিন কাঁর নাতনী বাইরের বড়বাজারের মহাজনের কি দুর্গতি? উপযুক্ত ছেলে, ঐ ছিল ভেতরে, মোটর চালিয়ে ডায়মণ্ডহারবার বেড়াতে গেল আর ফিরল না। শুধু বুড়ো খোঁজ—অনেক খুঁজে দেখা গেল যে, গ'ড়ের হাটের কাছে এক বি, বটগাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে মোটরখানা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে পড়ে রয়েছে, আর তার সঙ্গে মোটরের মালিকও!···নিজের মোটরের ত ঐ হাল, আর ট্যাক্সী ত কথাই নেই, রোজ অন্ততঃ চারটে ক'রে এ্যাক-সিডেণ্ট এই কলকাতা শহরেই হচ্ছে। এই ত গত বুধবারের আগের বুধবারে আমাদের চোখের সামনে একখানা ট্যাক্সী—

ভদ্রলোকের কথায় একটা আকস্মিক বাধা পড়িল। ওধারের বেঞ্চি হইতে একটি ভদ্র মহিলা সহসা হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। আমরা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া সেই দিকে মনোযোগ দিলাম; 'কি হ'ল,—কাঁদছেন কেন'—'কি হয়েছে মশাই?' ইত্যাদিতে অন্য সব প্রসঙ্গ চাপা পড়িয়া গেল।

অনেক প্রশ্ন করিবার পর তাঁহার সঙ্গীদের কাছে জানা গেল যে, ভদ্রমহিলার একমাত্র জামাতা ট্যাক্সী ও বাসে ধাক্কা লাগিয়া সম্প্রতি প্রাণ হারাইয়াছেন। মোটর দুর্ঘটনার এই প্রত্যক্ষ স্বরূপে আমরা সকলেই অভিভূত হইয়া পড়িলাম। বিরাজবাবু নিজে অনেকখানি সরিয়া বসিয়া নবাগত ভদ্রলোককে বসিবার স্থান করিয়া দিলেন।

ওধারের ভদ্রমহিলার কান্না কমিয়া আসিলে প্রায় সমস্ত গাড়ী জুড়িয়া শুরু হইল বিবিধ, বিচিত্র দুর্ঘটনার আলোচনা। নিজের জীবনে যে যত রকম দুর্ঘটনা দেখিয়াছেন, তাহাই মহা উৎসাহে বর্ণনা করিতে বসিলেন। যাঁহারা দেখেন নাই, তাঁহারা শোনা কথাকে অলঙ্কার

দিয়া বর্ণনা করিতে বসিলেন এবং খবরের কাগজের আদ্যশ্রাদ্ধ হইতে লাগিল।

ইতিমধ্যে আমাদের নবাগত ভদ্রলোকটির বিড়ি টানা শেষ হইয়া আসিয়াছে, তাঁহার তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে আর সকলের কথা ডুবাইয়া পুনশ্চ কহিলেন, কোন যানবাহনটা নিরাপদ? সাইকেল? শহরে সাইকেল চালানো ত প্রাণ হাতে ক'রে, এই বুঝি ট্রামের সঙ্গে ধাক্কা লাগল, ঐ বুঝি বাস চাপা পড়লুম, সর্ব্বদা এই ভ ঘোড়ার গাড়ীর ত কথাই নেই, ঘোড়া খেপে উঠলেই চোখে অন্ধকার। প্রভাত মুখুজ্জে, কি অনুরূপা দেবীর গল্পের নায়ক যদি কাছাকাছি থাকে তবেই রক্ষে, বাঁশ টেনে ঘোড়াকে আটকাবে (যদি গাড়ীতে নায়িকা হবার উপযুক্ত কেউ থাকে), নইলে সটান নিমতলার ঘাটে।

এক অর্ব্বাচীন বালক বলিয়া ফেলিল, আগেকার হেঁটে যাওয়াই ভাল ছিল।

—ওরে বাবা! বিংশ শতাব্দীর সভ্যতায় ত পদচারীদের স্থানই নেই। ট্রাম-বাস-মোটর-ঘোড়া এসব ত আছেই, মায় রিক্সা চাপা পড়া পর্য্যন্ত, আর যেখানে গাড়ী-ঘোড়া নেই সেখানে সাপ-খোপ আছে।

সম্মুখের বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি ফোঁস করিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, বাইরে বেরোলেই অপঘাত মৃত্যুর আশঙ্কা, তার চেয়ে ঘরে বসে থাকাই ভাল।

—কিছুনা, কিছুনা, দেখলেন-ত বিহারের ভূমিকম্পের সময়? যারা বাইরে-টাইরে ছিল তারা বরং একরকম ক'রে বেঁচেছে, যারা ঘরের মধ্যে ছিল, তাদের-ত আর চিহ্ন রইল না। আমাদেরই এক

আলাপী ভদ্রলোকের কি হ'ল তিনি আর তাঁর নাতনী বাইবেব বাস্তায় পায়চাবী করছিলেন, আর বাড়ীব প্রায় সবাই ছিল ভেতরে, মশাই—সেই সতেরজন লোকের মধ্যে একজনও বাঁচল না! শুধু বুড়ো আব সেই নাতনী! বুড়ো ত পাগল হয়ে গেছে—

মথুরাযাত্রী বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি আব সহ্য করিতে পারিলেন না, ভঁ্যাক কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিলেন, মশাই তাহ'লে কি আব কোন উপায় নেই?

নবাগত ভদ্রলোকটি চিন্তিত মুখে কহিলেন, নাঃ—এক্সিডেণ্টেব হাত এড়াবাব কোনও উপায় নেই। তবে যদি অল্প-স্বল্প কিছু হয় কিম্বা পবিব বদেব কোনও ব্যবস্থা করতে চান তাহলে উপায় আছে বটে।

চারিদিক হইতে ব্যগ্র-ব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন আসিতে লাগিল, কি বকম, কি বকম? কি বললেন মশাই, ইত্যাদি।

ভদ্রলোক কহিলেন, আজকাল সব বিলাতি ইনসিওরেন্স কোম্পানীই এ্যাক্সিডেণ্ট ইনসিওরেন্স করছে, সেগুলো মন্দ নয়। যদি হাত-পা ভাঙ্গে কিম্বা একেবাবে মারা যান তাহলে মোটা টাকা দেবে, আব যদি অসুখ বিসুখ কবে তাহলেও মাসহারা দেবে—ভাবী চমৎকাব পলিসি। আমাব কাছেও আছে একটা প্রস্‌পেকটাস্ দেখবেন? স্কট্‌স্ ইউনিয়নেব এ্যাক্সিডেণ্ট পলিসি, নাম করা পলিসি, অনেক পুরোনো কোম্পানী, প্রায় একশ বছরের—দেখবেন?

ভয়ের পরিবর্ত্তে অনেকেরই মুখে-চোখে ক্রোধের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল, এক জন ত স্পষ্টই বলিয়া ফেলিল, ওঃ আপনি এজেণ্ট বুঝি? তাই অত ভয় দেখাচ্ছিলেন?

ভদ্রলোক এই দোষারোপে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না। ধীবে

সুস্থে স্যুটকেশ খুলিয়া কতকগুলি কাগজ-পত্র বাহির করিয়া কহিলেন, আজ্ঞে ভয়ত আর আমি মিথ্যে ক'বে দেখাইনি। কোন্ কথাটা ওর মধ্যে বাজে ? ·হাত-পা ভেঙ্গে যখন বাড়িতে এসে বসবেন, তখন যদি টাকাটা পান সেটা ভাল, না ভিক্ষে করা ভাল ? না—কি আপনি টাকাটা পেলে আমায় দেবেন ?

তারপর প্রশান্তভাবে মথুরাযাত্রী ভদ্রলোকের হাতে একখানা প্রস্‌পেক্‌টাস্ দিয়া কহিলেন, দেখুন, ভাল করে পড়ে দেখুন, বুঝতে না পারলে বরং আমায় বলবেন, বুঝিয়ে দেব—

যে ভদ্রলোক কনুই টানিয়া লইয়াছিলেন, তিনি পুনরায় জানলায় হাত বাহির করিয়া বসিলেন।

চাকর

চাকর তিনদিনের জন্য বাড়ী গিয়া আজও ফেরে নাই, তাহার উপর ঠিকে ঝিটিও হঠাৎ ডুব মারিল। সকালবেলা ঘুম ভাঙ্গিয়া সংবাদটি শোনামাত্র আতঙ্কে বুক কাঁপিয়া উঠিল। কহিলাম, সে কি গো?

গৃহিণী ঝঙ্কার দিয়া কহিলেন, কি তা উঠে একবার উঁকি মেরে দ্যাখো না, উঠোনে এঁটো বাসন স্তূপাকার হয়ে পড়ে রয়েছে! সাড়ে সাতটা বাজে, আর কখন আসবে তাই শুনি? কবে থেকে বল্‌ছি যে ঠিকে ঝি-চাকর দিয়ে চল্‌বে না, একটা রাতদিনের লোক দ্যাখো, তা কে যেন কাকে বল্‌ছে! তোমার আর কি, তোমাকে ত ভুগতে হয় না! আমার যেন মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে করছে।

তিনি বিলাপ করিতে করিতেই নীচে নামিয়া গেলেন। আমি কোন রকম প্রতিবাদ করিলাম না, জানাইলাম না যে, রাতদিনের লোক পাইবার জন্য বহু সাধনা করিয়াছি, কিন্তু পাই নাই—অবশেষে তিনিই বেশী খরচের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া আমাকে সান্ত্বনা দিয়াছেন। শুধু উঠিয়া তখনই বাজারে গিয়া কলাপাতা কিনিয়া আনিলাম, মাটির গেলাস ও ভাঁড় সংগ্রহ করিলাম এবং জানাইয়া দিলাম যে, আজ আমি অফিসেই যাহা হয় কিছু খাইয়া লইব। এত বেলায় বাসি কাজ সারিয়া আবার আমার জন্য তাড়াতাড়ি রাঁধিতে হইবে না।

কিন্তু মেঘ কিছুতেই কাটিল না। সংসারে লোক আড়াইখান, কলাপাতা ও ভাঁড় ভরসা করিয়াছি, দুবেলা শুধু মাছের ঝাল আর দধি দিয়া ভাত খাইতেছি তবু তাঁহার মুখ এক মুহূর্ত্তের জন্যও প্রসন্ন হইল না। অবশেষে চার দিনের দিন, বোধহয় সেটা শনিবার, সকাল করিয়া অফিস হইতে ফিরিয়াছি—মরিয়া হইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম ঝি-চাকরের অন্বেষণে। প্রতিজ্ঞা করিলাম যাহা হউক একটা ব্যবস্থা না করিয়া ফিরিব না

সবে সদর দোরে পা দিয়াছি, বছর-পঞ্চাশেক বয়সের একটি কালো মত লোক ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া কহিল, বাবু মশায়, নমস্কার

মনের মধ্যে বহু অসম্ভব আশা গুঞ্জরণ করিয়া উঠিল, কহিলাম, কী চাই বাপু তোমার?

সে কহিল, বাবু লোকজন রাখবে আপনারা?

'সাধুচরণ ভাত খাইবি? না হাত ধুইব কোথায়?

আমার তখন সেই অবস্থা কিন্তু তবু অন্তরের পুলক যতদূর সম্ভব চাপিয়া গম্ভীর মুখে প্রশ্ন করিলাম, তোমার বাড়ী কোথায়?

সে আঙ্গুল দিয়া উত্তর দিকটা দেখাইয়া কহিল, আজ্ঞে ঐ দক্ষিণের দিকে। লক্ষ্মীকান্তপুরের কোথা করঞ্জলি গাঁ আছে, সেই করঞ্জলি হ'তে আমার বাড়ী তিন কোশ পাকা।

দক্ষিণের লোক শুনিয়া মনটা দমিয়া গেল, তবু কহিলাম, কি কাজ করতে পারবে?

সে খুব বেশী রকমের ভরসা দিয়া কহিল, আজ্ঞে যে কাজ বলবে আপনি! বাসনমাজা, জলতোলা, বাটনাবাটা—মায় বাজার পর্য্যন্ত করতে পারব।



বাবু লোকজন রাখবে আপনারা?

ঈষৎ সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়া কহিলাম, পারবে ত সব করতে? না কি মুখেই—?

খুব উচ্চাঙ্গের হাসি হাসিয়া কহিল, আজ্ঞে কাজ দিলেই বুঝতে পারবে!

আশ্বস্ত হইয়া কহিলাম, তাছাড়া তুমি কেমন লোক, স্বভাব চরিত্র কেমন—কি করে জানব আমরা ? এখানে কোথাও কাজ করেছ ?

আবার সেই হাসি। সে কহিল, আমার স্বভাবচরিত্তির কি বুঝতে এখনও বাকী আছে আপনার ? সে সেই প্রথম আঁচড়েই বুঝে নিয়েছে। আপনারা লেখাপড়া শিখেছ কি অমনি ? কত জানবুঝ আপনাদের।

লোকটি নিছক মোসাহেবী করিয়া কাজ বাগাইবার চেষ্টা করিতেছে বুঝিয়াও তাহার বুদ্ধিশুদ্ধি দেখিয়া খুশীই হইলাম। আর খুশী না হইয়াও উপায় ছিল না, গৃহিণীর মুখে যে আঁধার জমিয়াছে, যাহাকে হোক ধরিয়া না আনিলে চলিবে না। চুরি গেলে বরং সহিবে কিন্তু এ অবস্থা অসহ্য !

লোক পাওয়া গেছে, বিশেষ করিয়া দিনরাতের, শুনিয়া মুহূর্ত-মধ্যে তাঁহার মেঘ অনেকখানি কাটিয়া গেল এবং সন্দিগ্ধকণ্ঠে কহিলেন, যাকে তাকে ত ধরে আনলে, যদি চোর ছ্যাঁচোড় হয় ? মনে মনে বলিলাম, সে জন্য দায়ী তুমিই এবং মুখে বলিলাম, না, বুড়োমানুষ ভালই হবে !

কিন্তু কাজের প্রথম ফর্দ্দ তাহার কাছে পেশ করিবামাত্র বোঝা গেল যে, সে চোর না হউক কাজের লোকও বিশেষ নয়। রান্নাঘর ধুইবার প্রস্তাব উত্থাপনেই বলিল, হ্যাখো মা, রান্নাঘরটা আপনিই আজ ধুয়ে নাও, আমি বরং বাসনগুলো মাজি ততক্ষণ। বেলা হয়ে গেছে ঢের।

বলিয়া আমাদের সম্মতি বা মতামতের অপেক্ষামাত্র না করিয়া কলতলায় গিয়া বাসন মাজিতে বসিল। গৃহিণী আমার মুখের

পানে চাহিলেন, আমি সে দৃষ্টি এড়াইয়া টবের উপরের বেল ফুলের গাছটার দিকে চাহিয়া রহিলাম।

গৃহিণী রান্নাঘর নিজেই ধুইয়া লইলেন, কিন্তু কাপড় কাচিয়া জল দিতে বলায় আবার গণ্ডগোল বাধিল। সে একঘড়া জল দিয়াই কহিল উতিই চালিযে নাও মা, বুড়োমানুষ আর বেশী জল দিতে পারি না।

খুকীর মা বিস্মিত হইয়া কহিলেন, সে কি সনাতন, মোটে একঘড়া জলে কখনও রান্না করা চলে ?

অম্লানবদনে সনাতন জবাব দিল, একটা ঘড়া জল কি সোজা হ'ল বাছা ? আর নিহাত না পাবো এক-আধ ঘটি জল নিজেই তুলে নিও—

তাহার পর উত্তরের অপেক্ষামাত্র না করিয়া সে নীচে নামিয়া গেল। অল্পক্ষণ পরেই আমি নীচে নামিয়া দেখিলাম সে গভীর নিদ্রাভিভূত।…

অপরাধীর মত আবার উঠিয়া আসিলাম। মেঘ যেটুকু কাটিয়াছিল তাহার দ্বিগুণ প্রায় ততক্ষণে পুনরায় আসিয়া জমা হইয়াছে, আমাকে দেখিয়া তিনি অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, তোমাকে যখন লোক ঠিক করতে বলা হয়েছে তখনই জানি যে একটা কেলেঙ্কারী হবে। জানা নেই, শোনা নেই, যাকে সামনে পেলে তাকেই ধরে নিয়ে এলে। অত তাড়াতাড়ির দরকারটা কি ছিল ? আমিই ত কাজ চালিয়ে নিচ্ছিলাম, কোন্ কাজটা আটকাচ্ছিল তাই শুনি !

এসব প্রশ্নের জবাব দেওয়া শুধু নিষ্প্রয়োজন নয়, বিপজ্জনক। সুতরাং কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলাম, কালকের দিনটা দেখ, না হয় তাড়িয়ে দিতে কতক্ষণ ?

কিন্তু আশ্চর্য্য সনাতনের নিদ্রা, রন্ধন সমাপ্ত হইবামাত্র তাহার

ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল এবং বেশ প্রশান্তমুখে উঠিয়া আসিয়া সামনের ছাদে বসিয়া কহিল, দাও গো মা, কি দেবে, যা-হয় দুটো পেটে দিই, পেটটা জ্বলতেছে বড়—

ভাত খাইল প্রচুর এবং পরক্ষণেই মাদুর বিছাইয়া শুইয়া পড়িল। গৃহিণী একবার তাহার দিকে আর একবার আমার দিকে ভয়ঙ্কর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, কালই সকালে ওকে তাড়িও আমার চাকর দরকার নেই—

সে রাত্রিটা ভাল করিয়া ঘুমাইতে পারিলাম না, সকালে উঠিয়া কি করিয়া তাহাকে তাড়াইব এবং আর কোথায়ই বা লোকের চেষ্টা দেখিব, ভাবিতে ভাবিতে বহুরাত্রি পর্যন্ত বিনিদ্র কাটাইয়া দিলাম। কিন্তু পরের দিন সকালে গৃহিণী এবং আমি, দুজনেই একসঙ্গে ঘুম ভাঙ্গিয়া বাহিরে আসিয়া দেখি সনাতন তাহার বহুপূর্ব্বেই উঠিয়াছে, ঘরবাড়ী ধোওয়া মোছা শেষ করিয়া কলতলায় বাসন লইয়া মাজিতে বসিয়াছে। আড়চোখে চাহিয়া দেখিলাম গৃহিণীর মুখের ভাবে নব ভক্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে সুতরাং তাহাকে সকালেই তাড়াইবার প্রস্তাবটা ভুলিয়া তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গেলাম।

সকালে বাজার-হাট সারিয়া বাড়ী ফিরিয়া দেখি আবার মেঘ
গৃহিণী কহিলেন, তোমার গুণের চাকর বাটনা বাটতে পারবেন না গো! বলেন, মসলা বাট্‌লে আমার হাত জ্বালা করে, শুধু হলুদ বাট্‌তে পারি।

ক্রুদ্ধ স্বরে সনাতনকে ডাকিলাম, কহিলাম তুমি নাকি মসলা বাটবে না বলছ?

সে কহিল, বলি কি আর সাধে, হাত জ্বলে যে।

অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলাম, হাতই যদি জ্বলে ত কাজ করতে

এসেছ কেন? ঘরে গিয়ে বসে থাকগে। অর্দ্ধেক কাজ যদি আমরাই ক'রে নিলুম ত চাকর রাখবার দরকারটা কি বলতে পারো?

সেও রীতিমত ঝাঁঝের সহিত জবাব দিল, ভোর থেকেই ত কাজ করতে লেগেছি, এই আড়াইটে প্রাণীর মসলা একটুখানি তাও আপনারা বেটে নিতে পারবে না? বেশ তা হ'লে শীল দাও, আমিই বাটতিছি—

কিন্তু শীল লইয়া বসিতেই বোঝা গেল যে সে বাটনা আদৌ বাটিতে জানে না, তাহারে ও কর্ম্ম করিতে দেওয়াই বিড়ম্বনা। অগত্যা গৃহিণী-কেই সে কাজ সারিয়া লইতে হইল। আমি বিকালের দিকেই ইহাকে তাড়াইয়া আর একটি লোকের চেষ্টা দেখিব এমন একটা আভাষ দিয়া সেখান হইতে সরিয়া পড়িলাম। দুশ্চিন্তার আর সীমা রহিল না।

কিন্তু সনাতন যে বিতাড়িত হইবার লোক নহে, তাহা দ্বিপ্রহরে খাইতে বসিয়াই বোঝা গেল। সে দিন ঝোল মাখিয়া ভাত মুখে তুলিয়াই কহিল, আহা মা, কি রান্নাই রেঁধেছ, যেন অমর্ত্ত!

পুলকিত-মুখে খুকীর মা প্রশ্ন করিলেন, কোনটা ভালো লাগল সনাতন?

সে চক্ষু প্রায় মুদ্রিত করিয়া কহিল, কোনটার কথা বলব বল দেখি মা, কাল থেকে যা খেয়েছি সব যেন মুখে লেগে আছে। যেমন কাল রাতের বেলা মাছের ঝোল খেয়েছি, তেমনি এখন এই নিমঝোল। পোড়ারমুখো উড়ে ঠাকুরগুলো কি রাঁধতে জানে! ঝাঁটা মারো তাদের রান্নার মুখে।

খুকীর মা আরও খানিকটা নিমঝোল তাহার পাতে ঢালিয়া দিয়া কহিলেন, উড়ে ঠাকুরের রান্না কোথা খেলে সনাতন?

সে জবাব দিল, আমাদের দেশে বাবুদের বাড়ী। ঐ ঠাকুর ব্যাটারা আজকাল সব দেশে জুটেছে।···বাবু যে পরিবারকে কোন কাজ করতে দেয় না। নাকি তাঁর পরিবাবের অঙ্ ময়লা হয়ে যাবে।

গৃহিণী আড়ে আমার দিকে চাহিয়া কহিলেন, বল কি সনাতন ? তাঁর পরিবার কি খুব সুন্দর দেখতে।

সে উত্তেজিত হইয়া জবাব দিল, পোড়া কপাল। বাবুর পবিবা'ব না'কি আবার সোন্দর। তোমার পায়ের নোকের কাছে দাঁড়াতে পারবে সে ?

প্রেয়সীব মুখ লজ্জায় ও গর্ব্বে লাল হইযা উঠিল, তিনি কহিলেন, ও আমার কপাল! আমি নাকি আবার সুন্দর! আমি সুন্দব ত কুচ্ছিৎ কে!

সনাতন কহিল, তবে একটা কথা বলি মা, আমি বুড়োমানুষ, মনে কিছু ক'রো না, বাবুদের বাড়ী তোমার মত একটা মেয়েছেলে আছে মনে করো ? একটা নেই!

গৃহিনী সপুলক ভ্রূকুটি করিযা কহিলেন, আচ্ছা, আচ্ছা, হয়েছে। তুমি চুপ কর দেখি!

কিন্তু আমি বুঝিলাম, লোক আর দেখিতে হইবে না।

হইলও তাহাই। আহারাদির পর ঘরে ঢুকিয়াই তিনি কহিলেন, তা'হলে ওকে জবাব দেবার কি হবে ?

বলিলাম, এখনই দিয়ে দিই। বিকেলের দিকে আর একটা লোক খুঁজতে বেরোতে হবে আর কি!

গৃহিণী নিঃশব্দে কিছুক্ষণ পান চিবাইয়া বলিলেন, আমি বলি কি, আজ আর জবাব দিয়ে কাজ নেই, তুমি ভেতরে ভেতরে একটা লোক

দেখ ততক্ষণ, ভাল লোক পেলে তখন ওকে তাড়ালেই হবে। তবু ত খানিকটা কাজ ক'রে দিচ্ছে, কি বল ?

উদাস কণ্ঠে কহিলাম, দেখ যা ভাল বোঝ' এবং পরক্ষণেই নিশ্চিন্ত হইয়া পাশ ফিরিয়া শুইলাম। সেইদিন হইতে সনাতনের জয়যাত্রা অপ্রতিহত গতিতে শুরু হইল। কাজ সে অর্দ্ধেকের বেশীই করে না, কিন্তু এমন গৃহিনীর মন বুঝিয়া কথা বলে যে, তিনি সে সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য করেন না। তাহার ধূর্ত্ততা দেখিয়া আমি মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি অনুভব করিতাম, হয়ত কখন কি করিয়া বসে, অথচ এমন কোন তাহাব অসাধুতার প্রমাণও পাওয়া যায় নাই, যাহাতে কথাটা শ্রীমতীর কাছে পাড়া যায়।

এইভাবে মাস-কয়েক কাটিল। সনাতন এখন বাড়ীর ছেলেবও বেশী, গৃহিণী-স্থানে তাহার প্রতিষ্ঠা। সে-ই কোথা হইতে একটা ঠিকা ঝি যোগাড় করিয়া দিয়াছে, অর্থাৎ নিজে যেটুকু কাজ আগে করিত, এখন আর তাহাও করে না। আমি প্রতিবাদ করি না, কারণ এই দীর্ঘ সাত-আট বৎসরের দাম্পত্য অভিজ্ঞতায় এইটুকু বুঝিয়াছি যে, গৃহিণীর ব্যবস্থার প্রতিবাদ করা অপেক্ষা বিষধর সর্পকে আলিঙ্গন করা বরং নিরাপদ। আরও একটি কারণে প্রতিবাদ করার প্রয়োজনও হয় নাই, সনাতন এমন নিটোল ভাবে তাঁহার রন্ধনের প্রশংসা করিত যে, তিনি ঠাকুর রাখার নাম পর্য্যন্তও মুখে আনেন নাই। তাহাতে খরচও কিছু বাঁচিয়াছে, দেহেও মেদ কমিয়া শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে।

এই ছয় মাসের মধ্যে কিন্তু সনাতনের ঘর হইতে একখানিও চিঠি আসে নাই, সে-ও কোনদিন কোথাও চিঠিপত্র লেখে নাই, ফলে যে

তাহার কোথাও বাড়ী-ঘর আছে সেকথাটা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। সহসা সেদিন পিওন তাহার নামে একখানি চিঠি দিয়া গেল। খামে আঁটা চিঠি, কদর্য্য বাংলা হস্তাক্ষরে লেখা ঠিকানা। সনাতনকে ডাকিয়া চিঠিখানা দিতেই সে সেটা লইয়া সোজা বাহিরে চলিয়া গেল এবং অল্পক্ষণ পরেই নিরতিশয় শুষ্কমুখে আসিয়া গৃহিণীকে কহিল, মা ছোট ছেলেটার বড্ড অসুক, বোধহয় আর বাঁচে না—

গৃহিণী ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, সে কি সনাতন! কে খবর দিলে? কি হয়েছে?

সনাতন কাঁদো কাঁদো মুখে কহিল, ঐ যে টাইফোর্ড না কি বলে, তারই জ্বর নেগেছে আজ আট দশ দিন হ'ল। আমার শাশুড়ীর কাছে আছে কিনা, তিনি চিঠি লিখেছে—

গৃহিণীর চক্ষু ছল্ ছল্ করিয়া আসিল। তিনি কহিলেন, তা'হলে তোকে ত একবার যেতে হয় সনাতন।

সনাতন কাপড়ের খুঁটে চক্ষু মুছিয়া কহিল, যা বলো আপনি। তাহ'লে কিন্তু মা বাবুকে বলে মাইনে ছাড়া দশটি টাকা দেওয়াতে হবে। আমি বরং দুমাস মাইনে নোবোনা—

বলা-বাহুল্য তিনি তৎক্ষণাৎ সুপারিশ করিলেন। আমি তাঁহাকে আড়ালে ডাকিয়া কহিলাম, টাকা ত দিচ্ছ, যদি আর না আসে?

তিনি ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, সেরকম মানুষ ও নয়! এইত ছ'সাত মাস আছে, কিছু কি ঠকিয়ে নিয়েছে তোমার কাছে? ছেলেটার অসুখ, যদি বিনা চিকিচ্ছেয় মরে যায়? না হয় গেলই দশটা টাকা—

অগত্যা টাকাটা বাহির করিয়া দিলাম। সনাতন ভূমিষ্ট হইয়া

প্রণাম করিয়া, পদধূলি জিভে ঠেকাইয়া, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সে ফিরিয়া আসিয়া পৌঁছিবে, গৃহিণীকে বার বার এমনি আশ্বাস দিয়া চলিয়া গেল। আমিও স্নান-আহারাদি সারিয়া অফিসে বাহির হইয়া পড়িলাম।

কিন্তু ট্রামে উঠিয়া ট্রাম ভাড়ার পয়সা দিবার জন্য মনিব্যাগ বাহির করিয়াই স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। শ্যালিকার কন্যার বিবাহ, ফিরিবার পথে তাহার জন্য একখানা ভাল কাপড় কিনিয়া আনিব বলিয়া দশ-টাকার দুইখানি নোট মনিব্যাগে পুরিয়া রাখিয়াছিলাম। তাহা ছাড়াও খুচ্‌রা টাকা-পয়সা কিছু ছিল, সে সমস্ত কিছুই নাই। শুধু একটি মাত্র আনি দয়া করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। খুব সম্ভব ট্রামে উঠিয়া অপ্রস্তুত হই—এই আশঙ্কাতেই!

অফিসে যাওয়া আর হইল না, ট্রাম হইতে নামিয়া যতটা পথ গিয়াছিলাম আবার হাঁটিয়াই ফিরিয়া আসিলাম। কিন্তু দরজায় পা দিয়াই বুঝিলাম যে, বিপদের সেইখানেই শেষ নহে। গৃহিণী তখনও স্নান করেন নাই, নীচের রকে স্তব্ধ হইয়া শুষ্ক মুখে বসিয়া আছেন। আমাকে দেখিয়া আর ভূমিকা না করিয়া বলিয়া ফেলিলেন, খুকীর হারটা সকালে কোঁড়া কেটে গিয়েছিল ব'লে খুলে বালিশের তলায় রেখেছিলুম, আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

আমি কিছুক্ষণের জন্য স্তম্ভিত হইয়া গেলাম, শুধু যাহা নিশ্চিত জানিতে পারিয়াছি তাহার জন্য নহে, যাহা এখনও অজ্ঞাত তাহারই আশঙ্কায়। তাহার পর খালি মনিব্যাগ তাঁহার দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া কহিলাম, প্রায় তেইশ টাকা ছিল, এক পয়সাও নেই।

তারপর দুজনেই স্তব্ধ!

মিনিট দুই আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিবার পর গৃহিণী কান্নার সুরে

কহিলেন, আমি কি ক'রে জানব। এত দিন রয়েছে কখনো কিছু করেনি ব'লেই আমি বললুম—। এখন যত দোষ আমারই। আমি তো তখনই বলেছিলুম, চেনা নেই শুনা নেই, কাকে ধরে আনলে—

আমি আর নরম হইলাম না। বরং কঠিন কণ্ঠেই কহিলাম, যা গেছে তা তো গেছেই, এখন দ্যাখো ভাল ক'রে আরও কি গেল—। .. ইস্—উল্‌টে ঠকিয়ে আরও দশটা টাকা নিয়ে গেল গা—

গৃহিণী বহুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন, কৈ আর ত কিছু হারিয়েছে বলে মনে হচ্ছে না।

আমি শুধু জবাব দিলাম, তবু ভাল।

আরও কিছুক্ষণ ইতস্তত করিয়া তিনি কহিলেন, পুলিশে কি খবর দিয়েছ?

আমি কহিলাম, এখনও দিই নি, দেব মনে করছি—বিকেলেই দেবো।

হয়ত তাঁহার আরও কিছু বক্তব্য ছিল, কিন্তু খানিকটা ইতস্তত করিয়া শেষ পর্য্যন্ত তিনি চলিয়াই গেলেন। আমিও খরচ যতই হউক, লোকটাকে জেলে না দিয়া নিবৃত্ত হইব না, এমনি দৃঢ়সঙ্কল্প করিতে করিতে একটু দিবা-নিদ্রার ব্যবস্থা দেখিলাম। অফিসে যাওয়া আর সেদিন হইল না।

অপরাহ্ণে উঠিয়া থানায় যাইব ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আমি থানায় যাইবার পূর্ব্বেই থানার লোক আমার বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। ছোট গোছের দারোগা ও একজন জমাদার, দারোগাবাবুর হাতে একটি ফোটো। তিনি ফোটোখানি আমার চোখের সামনে মেলিয়া ধরিয়া কহিলেন, এ লোকটিকে চেনেন?

দেখি ইনি আমারই শ্রীমান সনাতন! কহিলাম, বিলক্ষণ চিনি। আমার বাড়ী ছ'মাস কাজ ক'রে আজই আমার মেয়ের হার, আর গোটা-ত্রিশেক টাকায় ঘা দিয়ে সরে পড়েছেন!

দারোগা বাবু কহিলেন চলে গেছে? ···ইস্—!

তাহার পর তাঁহার মুখ হইতে যাহা শুনিলাম তাহা সংক্ষেপে এই:—সনাতন ইতিপূর্ব্বে আসানসোলে কোথায় কাজ করিত, সেখান হইতে একজোড়া তাগা ও কিছু নগদ টাকা লইয়া সরিয়া পড়ে। তাহার পর ডায়মণ্ডহারবারের স্টেসন মাস্টারের বাড়ী হইতে প্রায় সাত আটশ' টাকার গহনা লইয়া একদিন সোজা মেদিনীপুরে গিয়া উপস্থিত হয়। সেখানেও পুলিশের গন্ধ পাইয়া একদা কিছু নগদ টাকা লইয়া পলায়ন করে। ইহার পর বৎসর-তুই তাহার কোন খবরই নাই। অবশেষে আমার বাড়ী সে চাকুরী করে—এই সংবাদ মাত্র আজই ইঁহাদের কর্ণ-গোচর হইয়াছে এবং কালবিলম্ব না করিয়াই উহার সন্ধানে উপস্থিত হইয়াছেন।

দারোগা বাবু কহিলেন কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে আমাদের চেয়ে ওর গোয়েন্দারা তাড়াতাড়ি খবর দেয়।·· যাক্ আপনি তাহ'লে আপনার কেসও লেখাবেন কি?

আমি ঘাড় নাড়িয়া কহিলাম, কি দরকার অনর্থক আর হাঙ্গাম ক'রে? যা হবার তা'ত হয়েছেই। আর ধরা পড়লে জেল ত খাটবেই!

ইহার পর বৎসর-দেড়েক কাটিয়া গেছে। সনাতনের কোন খবর পাই নাই, তাহার কথা এখন পরিহাসের সময় এক-আধবার ওঠে মাত্র, প্রকৃতপক্ষে তাহার কথা আমরা ভুলিয়াই গিয়াছি। কিন্তু সে যে আমাদের কথা ভোলে নাই, একদা তাহা ভাল করিয়াই বুঝিলাম।

সেদিন অফিস হইতে ফিরিয়া দেখিলাম গৃহিণীর অত্যন্ত ভালবাসার ভাব। মুখখানি খুশি খুশি, তাড়াতাড়ি আসিয়া আঁচল দিয়া আমার মুখ মুছাইয়া দিলেন, পাখাটা পূরাদমে চালাইয়া দিয়া নিজেই জুতার ফিতা খুলিতে বসিলেন।

বলাবাহুল্য, আমি শঙ্কিত হইয়া উঠিলাম। নূতন কোন গহনার ফর্দ্দ কিম্বা দামী সাড়ী কিম্বা অন্য কিছু, ঠিক বুঝিতে না পারিয়া দুশ্চিন্তার আর অবধি রহিল না। অবশেষে তিনিই বরফ দেওয়া বেলের সরবতের গ্লাসটি আনিয়া দিয়া কথাটা পাড়িয়া ফেলিলেন। কহিলেন, দেখ গো আজ একটা কাজ ক'রে ফেলেছি তার জন্যে কিন্তু বক্‌তে পারবে না।

মনে মনে কহিলাম, কিছু যে করিয়াছ তাহাতে তার সন্দেহ কি! কিন্তু মুখে শুধু বলিলাম ব্যাপারটা কি?

তিনি কহিলেন, দশটা টাকা এক জনকে দান করেছি।

মোটে দশ টাকা! তবু ভাল—হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

তিনি চাবির গুচ্ছটা নাচাইতে নাচাইতে কহিলেন, আজ সনাতন এসেছিল।

আমি বিস্ময়ের চোটে সোজা হইয়া বসিলাম, কহিলাম, তারপর?

তিনি জবাব দিলেন, এসেই টিপ্ ক'রে এক পেন্নাম। কিন্তু পায়ের ধুলো নিলে না; বললে, 'মহাপাতুকী মা আমি, চরণটা আর ছোঁব না'—তারপর কি কান্নাকাটি। বললে, 'মা এই তোমার দিব্যি বল্‌তিছি প্রথম চুরি যা করেছি সে ছেলের অসুখের জন্যেই। তারপর আর পুলিশে ঠিক থাকতে দেয়নি। এক যায়গায় যেমন থির হ'য়ে বসেছি অমনি খবর পেয়েছি যে, পুলিশ টের পেয়েছে, কাজেই পালাতে হয়েছে। আর যাবার সময় যদি কিছু না নে যাই, কি খাব বলো দেখি মা।'

অভিভূতের মত শুনিয়া যাইতেছিলাম। কহিলাম, তারপর?

তিনি বলিলেন, এখান থেকে পালিয়ে যাবার পর ঢাকায় গিয়ে ধরা পড়ে, তারপর জেল হয়েছিল। সবে পরশু জেল থেকে ছাড়া পেয়েচে। এখন একবার দেশে যেতে চায় ছেলেপুলেকে দেখতে, তার খরচা নেই। তাই কাকুতি-মিনতি ক'রে দশটা টাকা চাইলে, বললে, 'বাবু ত আর আমাকে রাখবেন না, তা যাই হোক্ যেমন ক'রে হোক্ গতর খাটিয়ে বাবুর যা নিয়েছি তা শোধ ক'রে দেব।' এমন কাঁদতে লাগল যে দেখে বড় মায়া হ'লো—তাই দশটা টাকা দিয়ে দিলুম। খুব অন্যায় করেছি কি?

আমি ঘাড় নাড়িয়া কহিলাম, তা করোনি। তবে দুটো কথা এর-পর থেকে মনে রেখো যে, জেল থেকে বেরোবার সময় সামান্য কিছু পয়সা দিয়ে দেয়, অন্তত লক্ষীকান্তপুরের গাড়ীভাড়া তাতে হয়ই। আর তা ছাড়া সনাতনের ছেলেপুলে নেই, ও বিয়েই করেনি।

গৃহিণী কিছুক্ষণ আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া কহিলেন, বিয়ে করেনি?…তুমি কি ক'রে জানলে?

এইবার তাঁহার অবস্থা দেখিয়া আমার মায়া হইল। কিন্তু তবুও ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করিয়া সত্য কথাই বলিতে হইল, সেই দারোগা বলে গিয়েছিল।

সাতটি পয়সার মূল্য

রমাপতির পরম বন্ধু সুরেশ। একই টেবিলে বসিয়া কাজ করে, চাই কি অবসর থাকিলে, তাহারও দুই একটি কাজ টানিয়া করিয়া দেয়। সুতরাং তাহারই কাছে টিফিনের সময় রমাপতি নিজের দুঃখের কাহিনী নিবেদন করিল, ভাই সুরেশ একটি টাকা ধার দিতে পার ?

সুরেশ চমকিয়া উঠিল। কহিল, কী বলছেন দাদা ? আজ মাসের উনত্রিশ তারিখে ?

রমাপতি কহিল, উনত্রিশ তারিখ বলেই ত বল্‌ছি ভাই, হাতে বাজার খরচার মত একটি পয়সাও নেই—আজ রাত্রে বাজার করে নিয়ে গেলে তবে রান্না হবে। তার ওপর বুদার অসুখ দেখে এসেছি, লেবু-বেদানা কিছু নিয়ে গেলে ভাল হয়। মুদীর দোকানে যতদূর হয় তার জন্য ভাবি না, কিন্তু বাজারটা ত আর ধারে চলে না, দুটো বেলা চালাই কি করে ?…দে না দাদা একটি টাকা, কাল মাইনে পেলে হাতে হাতে নিয়ে নিস্‌!

সুরেশ ব্যাকুলভাবে কহিল, তার জন্যে কি বলছি দাদা, কিন্তু মাসের শেষ তারিখে টাকা পাই কোথা, বলুন !

—বাড়ীতে টাড়ীতে কারুর কাছে—

মাথা নাড়িয়া সুরেশ জবাব দিল, কারুর কাছে নেই! তবে মাসিমার কাছে দু-দশ টাকা আছে বটে, তিনি খুচরো সুদে খাটান্‌, নগদ টাকাই থাকে। কিন্তু তিনি আমার কাছ থেকে পর্য্যন্ত সুদ নেন্‌—

রমাপতি সহসা যেন আলো দেখিতে পাইল, সে কত সুদ ?

—তা টাকায় এক আনা ক'রে নেবেন অন্তত।

রমাপতি মুখটি ছোট করিয়া কহিল, একদিনের জন্যও এক আনা নেবেন ?

কতক বিমর্ষ, কতক চিন্তাক্লিষ্ট মুখে সুরেশ কহিল, তার কমে যে দেবেন বলে মনে হয় না।...কিন্তু তাও ত আপনাকে তাহ'লে আমার বাড়ী যেতে হবে—

সুরেশের একমাত্র মাসী যে বৎসর-দুই পূর্ব্বে দেহ রাখিয়াছেন, এ কথা রমাপতির জানা ছিল, সুতরাং সে একটা ছোট রকমের দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল, তার আর উপায় কি বল, যেতেই হবে।...দুটো শনিবার পর পর জামাই এসেই সব গোলমাল হ'য়ে গেল !

রমাপতির বাড়ী পটলডাঙ্গায়। কিন্তু অফিস হইতে বাহির হইয়া সুরেশের সঙ্গে তাহাকে গ্রে ষ্ট্রীট পর্য্যন্ত যাইতে হইল। তাহার নিকট হইতে একটি টাকা লইয়া হাতীবাগানের বাজারে ঢুকিয়া নানাবিধ বাজার করিল। একেবারে দুই বেলার মত বাজার, অসুস্থ ছেলের জন্য লেবু, ডালিম, সব ! যাক্—ইহাতেই দুইটা দিন স্বচ্ছন্দে কাটিয়া যাইবে। মাছ খাওয়া হইবে না, তা না হউক, দুইবেলা মাছ না খাইলে মানুষ মরে না। এমনি বাজার কি কম হইল ?

রমাপতি বাজারের পুঁটলিটা একটু উঁচু করিয়া তুলিয়া তাহার ভারটা অনুভব করিয়া লইল, তারপর বাহিরে আসিয়া ট্রামের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। ঠিক সাতটি পয়সা পকেটে আছে, তাহার মধ্যে এখন ট্রামে করিয়া না ফিরিলে চলিবে না, রাতও অনেক হইয়াছে ; তাছাড়া বাড়ীতেও অসুখ ; সুতরাং ঐ তিনটি পয়সা বাদ দিলে বাকী থাকে চার পয়সা, সে চারটি পয়সা থাকাই উচিত। বিপদ

আপদ আছে, বাঁধিবার দেরী হইতে পাবে—তখন হয়ত ট্রামে কবিয়া ছুটিতে হইবে, সুতরাং এক আনা অন্তত কাছে থাকা ভাল।

হাতীবাগানের মোড়ে একপাল ছেলেমেযে সর্ব্বদা থাকে, যাহাদেব কাজ হইল আপোষে ঝগড়া কবা এবং মধ্যে মধ্যে ভিক্ষা চাহিয়া ভদ্রলোকদের বিরক্ত কবা। বয়স সেগুলির নিতান্তই অল্প, হয়ত নিজেদেব সামান্য প্রয়োজন ছাড়া ভিক্ষা করাব দবকাব নাই, কিন্তু তবুও তাহাদেব অতিশয মলিন পোশাক এবং নোংবা আকৃতির জন্য অনেকেই দয়া কবিয়া কিছু দেন। যাক্—বেশী পবিচয নিষ্প্রয়োজন, কাবণ আপনাদেব অনেককেই তাহারা নিত্য বিবক্ত করে।

তাহাদেবই একটি বছব আষ্টেকেব মেযে রমাপতির কাছে আসিয়া নাকে কান্না জুড়িয়া দিল। বমাপতি প্রথমে বাব কতক 'হবেনা' 'হবেনা' কবিল, তাবপব ধমক দিল। কিন্তু তাহাব হাত পাতাই বহিল, ঘ্যান ঘ্যানানিব বিরাম নাই, অবশেষে পুলিশেব ভয দেখাইতে সে হাত নামাইল। কিন্তু হাত সবাইতে গিযা তাহাব হাতটি হঠাৎ ঠেকিল বমাপতির পকেটে, সাততি তামাব পযসা বাজিয়া উঠিল।

মুহূর্ত্ত-কযেক বমাপতি অন্যমনস্ক ভাবে দাঁড়াইযা রহিল, তাহাব পবই বিদ্যুৎ বেগে ঘুবিযা দাঁড়াইযা একহাতে মেযেটার একটা হাত চাপিযা ধবিল এবং অপব হাতেব পুঁটলিটা ফুটপাথের উপবেই নামাইযা রাখিযা অকস্মাৎ তাহাকে কিল-চড় যথেচ্ছ মাবিতে শুরু করিল।

তারপরেই সে এক বিশ্রী গোলযোগ। মেযেটা তাবস্ববে চেঁচাইয়া উঠিল, চাবিদিক হইতে হৈ-হৈ করিয়া লোক ছুটিয়া আসিল। দেখিতে দেখিতে রীতিমত ভীড় জমিয়া গেল।

কি হয়েছে, কি হয়েছে মশাই? ওকে মারছেন কেন?



রমাপতি প্রথমে বার কতক 'হবেনা' 'হবেনা' করিল, তারপর ধমক দিল।

রমাপতি হাত থামাইয়া কহিল, ওইটুকু মেয়ে মশাই, পকেটমার! আমার পকেট মারবার চেষ্টা করছিল।

আর কিছু বলিতে হইল না। যে যে সেখানে উপস্থিত ছিল,

সকলেই শুরু করিয়া দিল—কিল, চড়, লাথি! যাহারা দূরে ছিল, তাহারা হাত বাড়াইয়া এক-আধ ঘা মারিয়া লইল, যাহারা আরো দূরে ছিল তাহাবা কাছে আসিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল। তখনও লোকেব বিবাম নাই, চারি দিক হইতে 'চোর চোব' বলিয়া চীৎকাব করিতে কবিতে লোক ছুটিযা আসিতেছে—

একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক এক পাশে দাঁড়াইযা ছিলেন, বোধ কবি ট্রামেবই অপেক্ষায়, কহিলেন ওইটুকু মেয়েকে অমন ক'বে মাবছেন কেন? মরে যাবে যে!

রমাপতি তখন হাঁপাইতেছিল। কহিল, মারব না? বলেন কি? পকেট কাটছিল আমাব, পকেট!··ঐটুকু মেযেবই এত বুকের পাটা, বড হ'লে ও কী হবে ভাবুন দেখি!

ভদ্রলোক অগত্যা দমিযা গিয়া কহিলেন, কিন্তু অতগুলো লোক মিলে একটা মেযেকে মারা কি উচিত? তাব চেয়ে ববং পুলিশে দিলেন না কেন?

বমাপতি রাগ করিযা কহিল, ওর মরাই ভাল।

কিন্তু আরও দুই একজন লোক, বোধ হয যাহাবা দূবে ছিল, তাহারা এই সময ধুয়া ধবিল, না, না, পুলিশেই দাও ওকে—রিফর্মেটবী জেলে দিক।

যেহেতু যে পকেটটা কাটিবাব চেষ্টা হইযাছিল, সে পকেটটা রমাপতির, সেই হেতু রমাপতিই অর্দ্ধমৃত মেযেটার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে থানার দিকে লইয়া চলিল। সে তখন গোঙাইতে গোঙাইতে মিনতি জানাইতেছে, ছেড়ে দাও বাবু, তোমার দুটি পায়ে পড়ি; আমি কিচ্ছুটি করিনি—

রমাপতি সে সব কথায় কান দিল না; অপরাধীকে প্রশ্রয় দেওয়া

কিছুতেই উচিত নয়, বিশেষ এই বয়েসের ছেলে-মেয়েদের !—কিন্তু কিছু দূরে গিয়াই তাহার স্মরণ হইল, বাজারের পুঁটলি এবং অসুস্থ ছেলে—! সে পাশের লোকটির দিকে চাহিয়া কহিল, আপনারা একটু থানা পর্য্যন্ত নিয়ে চলুন, আমার বাজারের পুঁটলি ওখানে পড়ে আছে, আমি নিয়ে আসছি—

অকস্মাৎ এই থানা-পুলিশের হাঙ্গামা ঘাড়ে পড়াতে সকলেরই উৎসাহ যেন কিছু নিভিয়া গিয়াছিল। কেহ কেহ মুখ বিকৃত করিয়া কহিলেন, আহা, নিজেই বাধিয়ে টাধিয়ে এখন আবার ছুতো ক'বে সরে পড়ল। কে এসব হ্যাঙ্গাম করে—আমরা কি দেখেছি ?

ফলে কিছুক্ষণের মধ্যেই ভীড়টা পাতলা হইয়া গেল, মেয়েটা অর্দ্ধ-মূর্চ্ছিত অবস্থায় ফুটপাথের উপরই পড়িয়া শুধু গোঙাইতে লাগিল।

ইতিমধ্যে রমাপতি ফিরিয়া আসিয়া দেখিল যে তাহার পুঁটলিটি সম্পূর্ণভাবে অন্তর্দ্ধান করিয়াছে। আগে, পিছনে, খাঁজে, কোণে—কোথাও তাহার চিহ্ন-মাত্র নাই। আশে পাশে অনুসন্ধান করিবার মত মানুষ পর্য্যন্ত নাই ! বায়স্কোপের ছবির মত রমাপতিব চোখেব সামনে ভাসিয়া উঠিল, রুগ্ন ছেলের মুখ, রান্নাঘরের অবস্থা, সুদের আনি এবং ঘড়ির কাঁটার হিসাব। সে খানিকক্ষণ মূঢ় জড়ের মত দাঁড়াইয়া রহিল, তার পর খানিকটা ছুটাছুটি চেঁচামেচি করিয়া পুঁটলিটার বৃথা খোঁজ করিল, তার পর ধীরে ধীরে আবার কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের রাস্তা ধরিয়া হাঁটিতে শুরু করিল ; সাত পয়সারই যাহা হউক কিছু বাজার পথে করিয়া লইয়া যাইতে হইবে—এতরাত্রে আর উপায় কি ?

সে নীরবে পথ চলিতে লাগিল, কিন্তু গতির তালে পকেটের সাতটি তামার পয়সা সমানভাবে অদ্ভুত একটা শব্দ করিয়া বাজিয়া চলিল।

মিথ্যার উপকারিতা

নেশাই বলুন আর পাগলামিই বলুন, অল্পবিস্তর আছে প্রায় সকল-কারই কিন্তু আমাদের সুধীরের মত সেটা এমন কাজে লাগিয়াছে কয়জনের ?

ভ্রমণের নেশাটা ধরিয়াছে তাহাকে বহুদিন, এমন কি বিড়িব নেশারও পূর্ব্ব হইতে, কিন্তু সেটা বিড়ির মত সুলভ নহে বলিয়াই বোধ-হয় আর ক্রিয়ায় পরিণত হইতে পারে নাই, দীর্ঘ দিন ধরিয়া মগজে বৃথা মাথা কোটাকুটি করিয়া ক্রমশ তাহা পাগ্‌লামিতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। অর্থাৎ টিকিট কাটিয়া রেলে চাপা তাহার জীবনে অদ্যাপি ঘটিয়া ওঠে নাই বটে, তবে ভ্রমণ-কাহিনী, টাইমটেব্‌ল্, পাঁজি ও ভারতেব মানচিত্রের সাহায্যে মানস ভ্রমণ একটি দিনের জন্যও বন্ধ থাকে নাই। বাঙ্গালা ভাষায় যত ভ্রমণ-কাহিনী আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইযাছে, তাহার কোনটিই সে বাদ দেয় নাই এবং বোধ করি প্রত্যেকটিই সে কোন না কোন উপায়ে সংগ্রহ করিয়া বার তিন চার করিয়া পড়িয়াছে। থিয়েটার বায়স্কোপের সখ তাহার ছিল না, পয়সা জমাইয়া সে রাস্তাব ধারের পুরাতন বইয়ের গাদা হইতে শুধু টাইমটেব্‌ল্ কিনিত। আর এই ভ্রমণ কাহিনী ও টাইমটেব্‌লের সাহায্যে সে বিরাট একটা বাঁধা খাতায় ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি তীর্থস্থান, প্রত্যেকটি শহর ও দ্রষ্টব্য বস্তুগুলির ধারাবাহিক তালিকা, কোন্ রেলপথে সেখানে পৌঁছিতে হয়, কোন্‌টার পর কোন্‌টায় গেলে সুবিধা হয়, কোথায় কটা ধর্ম্মশালা আছে, হোটেলের খরচা কত, ঘুরিয়া দেখিবার জন্য কত গাড়ীভাড়া

লাগে, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিত। ইদানীং পুরানো দরেও টাইমটেব্‌ল্‌ কিনিবার ক্ষমতা ছিল না বলিয়া সে অবসর-কালে হাওড়া ষ্টেশনে গিয়া কাঠের ফলকে আঁটা টাইমটেবল দেখিয়া তাহার নোটবুকের সহিত বিভিন্ন ট্রেনের সময়ের পরিবর্ত্তনগুলি মিলাইত এবং রবিবার দিন সারা দুপুর ধরিয়া সেগুলি মুখস্থ করিত।

কিন্তু এই নেশাটা করিত সে খুব গোপনে। তাহার আর্থিক অবস্থা এতই খারাপ যে, তাহার নামের সহিত এই নেশাটার কথা একত্রে উচ্চারণ করিলেও লোকের উপহাস পাইবার সম্ভাবনা ছিল। তাহার বাবাও দরিদ্র কেরাণী ছিলেন, মৃত্যুকালে কিছু রাখিয়া যাইতে ত পারেনই নাই, ছেলেকেও মানুষ করিয়া যাওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। সুধীর বার-দুই ম্যাট্রিক ফেল করিয়া কিছুদিন ঘরে বসিয়া থাকিবার পর সবে এক মার্চ্চেণ্ট অফিসে কুড়ি টাকা মাহিনায় চাকরীতে ঢুকিয়াছে, এমন সময়ে তিনি মারা যান অর্থাৎ বিধবা মা ও ছোট দুইটি ভাইয়ের ভার পড়ে সুধীরেরই মাথায়। তাহার পর বছর-আষ্টেক কাটিয়াছে, কিন্তু অভাব তাহার ঘোচে নাই, কারণ ইতিমধ্যে অফিসও তাহাকে দুই-তিন বার বদলাইতে হইয়াছে। এখন সে যেখানে কাজ করে, সেখানে পায় চল্লিশটি টাকা বেতন, তাহাতে গ্রাসাচ্ছাদন মাত্র চলে, সখ মেটানো চলে না।

সুতরাং তাহার এই উদ্ভট সখটার কথা সে খুব গোপনেই রাখিত। তবে হঠাৎ সেদিন যে সে এই সম্পর্কে অমন মিথ্যা কথাটা বলিয়া ফেলিল, তাহা নিতান্তই তাহার ভাগ্য বলিয়া ধরিতে হইবে।

সেও এমনি এক পূজার সময়, ছুটির মাত্র তিন চারিটি দিন বাকী আছে। অফিসের বাবুরা কেহ দেশে যাইবেন, কেহ যাইবেন বিদেশ

ভ্রমণে— তাহারই তোড়জোড় ও আলোচনায় অফিস মুখরিত, সেই গণ্ডগোলের মধ্যে একজন প্রশ্ন করিয়া বসিলেন, সুধীর বাবু কোথাও যাবেন নাকি ? বিদেশে-টিদেশে—?

একে এই সময়টায় এইসব আবহাওয়ার মধ্যে বসিয়া কাজ করিতে বরাবরই সুধীরের মাথা খারাপ হইয়া যাইত, তাহার উপর এই প্রশ্নে তাহার কান মাথা যেন ঝাঁ-ঝাঁ করিতে লাগিল। তাহার অবস্থা যে কি এবং সে যে কত মাহিনা পায়, তাহা সকলেই জানে সুতরাং প্রশ্নটা যে নিছক বিদ্রূপ, এই কথাটা মনে করিয়াই আরও তাহার মাথা খারাপ হইয়া গেল। সে এরকম মরিয়া হইয়াই কথাটা বলিয়া ফেলিল।

খাতাটা সামনের দিকে খানিকটা ঠেলিয়া দিয়া, চেয়ারে ঠেস দিয়া বসিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সুধীর জবাব দিল, বিদেশে ?······ন্-না !—কোথায় আর যাব। পুরোনো জায়গায় বার বার যেতে ভাল লাগে না !

প্রশ্নকর্ত্তা ত বটেই, অফিসের অন্যান্য বাবুরাও স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। মহেশবাবু সামনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া কহিলেন, পুরোনো জায়গা মানে ? আপনার কি সব ভারতবর্ষটা বেড়ানো শেষ হয়ে গেছে ?

হাতের পাশা তখন ফেলা হইয়া গিয়াছে, ফিরিবার আর উপায় নাই। সুতরাং তাহাকে অভিনয়টা ভাল করিয়াই করিতে হইবে বুঝিতে পারিয়া সুধীর প্রস্তুত হইল। বিনয় করিয়া জিভ কাটিয়া কহিল, পাগল ! তাই কখনও সম্ভব। তবে ঐ মোটামুটি জায়গাগুলো সবই একরকম শেষ করেছি—

মহেশবাবুর মুখটা যে পরিমাণ হাঁ হইয়া গিয়াছিল, তাহা আর বুজিল না। কিন্তু এবারে প্রশ্ন করিলেন কার্ত্তিকবাবু; পশ্চিমে তিনি নিজে বছর বছরই যান বলিয়া ঐ দিকটা সম্বন্ধেই ওয়াকিবহাল বেশী, তিনি কহিলেন দিল্লী, আগ্রা, ও সব সাইডে গিয়েছেন?

সুধীর হাসিয়া জবাব দিল, বিলক্ষণ! ওসব না দেখলে আর কি দেখলুম বলুন। আগ্রা, দিল্লী গেছি আমি যখন, তখন আমার বোধ হয় সতের বছর বয়স, ইস্কুল পালিয়ে চলে গিয়েছিলুম।

বিনয় একটু খোঁচা দিয়ে প্রশ্ন করিল, কিন্তু এত ঘুরলেন কি ক'রে সুধীরদা, আগে কি ভাল চাকরী করতেন? না বাপের পয়সা সব ঐ করে উড়িয়েছেন?

সুধীর প্রশান্ত মুখেই গলাটা নামাইয়া জবাব দিল, আরে পাগল, মামা যে রেলে কাজ করতেন, হরদম পাসে ঘুরেছি। পয়সা লাগত কি?

ইহার পর আর কিছুই বলা চলে না। কিন্তু বলা বাহুল্য যে অন্যান্য বাবুরা অত সহজে তাহাকে নিষ্কৃতি দিলেন না। তাহার পর ক্রমাগত নানারকম ভাবে চলিল তাহার পরীক্ষা। যিনি যেখানে গিয়াছেন তিনি সেখান সম্বন্ধে নানারকম প্রশ্ন করেন, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া, কখনও অতর্কিত ভাবে, কখনও বা কথার ছলে। সুধীরকে সেজন্য প্রতি মুহূর্ত্তেই প্রস্তুত থাকিতে হয়, সে আজকাল রাত জাগিয়া তাহার নোটবুক ঝালাইয়া লয়।

অবশ্য মুখস্থ থাকা সত্ত্বেও তাহাকে এক এক সময় দারুণ বিপদে পড়িতে হয়। একদিন কার্ত্তিকবাবু কাশীর গল্প করিতে করিতে বলিয়া বসিলেন, আচ্ছা বিশ্বনাথের গলিতে ঢুকতে বাঁ-হাতি সেই মসজিদটা

মনে আছে ত সুধীরবাবু?…সেই যে ছোট্ট মসজিদটা বড় রাস্তার ওপরেই—?

কোন কাঁচা মিথ্যাবাদী হইলে হয়ত তৎক্ষণাৎ ঘাড় নাড়িয়া সায় দিত, কিন্তু সুধীর গত কয়েক মাস যাবৎ মিথ্যা কহিতে কহিতে পাকিয়া গিয়াছিল, সে জানিত সঠিক না জানিয়া কোন ফাঁদে পা দিতে নাই। সে অনেকক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে কার্ত্তিকবাবুর মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া কহিল, মসজিদ, কই মনে ত পড়ছে না! হয়ত আছে, লক্ষ্য করিনি তখন ভাল ক'রে—

মহেশবাবু কার্ত্তিককে ধমক দিয়া কহিলেন, কার্ত্তিকটার যত গাঁজাখুরী, বিশ্বনাথের গলির মোড়ে আবার মসজিদ!…থাকলে ত তোমার নজরে পড়বে সুধীর। সুধীর সুস্থ হইল। ভাগ্যিস্!…সে সবিনয়ে হাসিয়া কহিল, ও কার্ত্তিকবাবু পরীক্ষা করছিলেন আমায়!…তা বটে, আমার মত অবস্থার লোক এত ঘুরেছে, এটা বিশ্বাস করা কঠিনই বটে, কার্ত্তিকবাবুর আর দোষ কি—

ফলে কার্ত্তিকবাবু বিষম অপ্রস্তুত হইয়া পড়েন।

কিন্তু এ সব ত গেল ছোট খাট পরীক্ষা, অগ্নিপরীক্ষা, উপস্থিত হইল ডিসেম্বর মাসে, যখন খোদ বড়বাবু দুই মাসের ছুটি লইয়া সেতুবন্ধ রামেশ্বর যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। সুধীরকে ডাকিয়া কহিলেন, ভাই সুধীর তোমার ত ওসব জায়গা ঘোরা আছে, দাও দিকি ভাল ক'রে একটা ছক কেটে, কোথা দিয়ে গেলে সুবিধে হয়, আর কোথায় কি থাকা-টাকার ব্যবস্থা—

সুধীরের মুখ এক মুহূর্ত্তের জন্য বিবর্ণ হইয়া গেল, গেঞ্জিটা বোধকরি সেই শীতের দিনেও ঘামে ভিজিয়া উঠিল। কিন্তু তাহার পরই দুর্গা নাম

স্মরণ করিয়া সে দৃঢ় হস্তে কাগজ কলম টানিয়া লইয়া বসিয়া গেল বড়বাবুর ভ্রমণের প্ল্যান তৈয়ারী করিতে। বিস্তৃতভাবে প্রত্যেকটি তথ্য লিখিয়া বড়বাবুর হাতে দিয়া বলিয়া দিল, মোটামুটি যতটা মনে পড়ল লিখে দিলুম বড়বাবু, তবে অনেকদিন আগে যাওয়া, দু-একটা ভুল হ'তে পারে।

আচ্ছা, আচ্ছা, তাতে আট্‌কাবে না—বলিয়া বড়বাবু তাহার পিঠ চাপ্‌ড়াইয়া বিদায় লইলেন।

ইহার পর দুইটা মাস যে সুধীরের কী দুশ্চিন্তায় কাটিয়াছে, তাহা বলিবার নয়। বড়বাবুকে সে চিনিত, যদি তাহার প্ল্যানের কোন গোলমাল হয় এবং সেজন্য তাঁহার কোন অসুবিধা ঘটে, তাহা হইলে 'পারমেনেণ্ট' হইবার আশা ত সুদূরপরাহত হইয়া যাইবে বটেই—চাকরী লইয়াও টানাটানি পড়িতে পারে। তাহার দিনেরাত্রে ঘুম হইত না।

কিন্তু বড়বাবু ফিরিলেন হাসিমুখে। প্রথম দিন অফিসে আসিয়া বসিতেই স্তাবকবৃন্দ যখন চারিদিক হইতে ঘিরিয়া ধরিল, তখন তিনি সুধীরের কাঁধে হাত রাখিয়া কহিলেন, হ্যাঁ, উপকার করেছে বটে আমার সুধীর ভায়া! এমন ছকটি কেটে দিয়েছিল যে, কোথাও আমাকে কোন বেগ পেতে হয়নি। মায় গাড়ী ভাড়া-টাড়া সব ও ঠিক ঠিক লিখে দিয়েছিল।

সুধীরের এতক্ষণে নিঃশ্বাস পড়িল। সে কহিল, মাদুরাতে গিয়ে ছত্রে জায়গা পেয়েছিলেন বড়বাবু ঠিক ?—

নিশ্চয়ই! ঐ আট আনাই নিলে ঘরের ভাড়া, সব ঠিক-ঠাক পেয়েছি ভাই।···আচ্ছা, হ্যাঁ, কিন্তু তোমার রামেশ্বরের পাণ্ডা তোমাকে চিনতে

পারলে না কেন? নাম করলুম, কোথায় তোমার বাড়ী বললুম, তবু কিছুতেই বুঝতে পারলে না!

সুধীর হাসিয়া কহিল, মূলেই যে ভুল বড়বাবু, ওখানে গিয়েছিলুম আমি যে মামার সঙ্গে। মামারই নাম লেখা আছে কিনা, তাঁর নাম করলেই ওরা ধরতে পারত।

ওঃ, তাই হবে।··· তাই ত বলি—

ইহার পর মাস-পাঁচেকের মধ্যেই সুধীরের চাকরী পাকা হইয়া যাইতে কিংবা এক লাফে মাসিক পাঁচ টাকা মাহিনা বাড়িতে কোথাও বাধা পাইল না। শুধু তাই নয়, এত বড় প্রত্যক্ষ প্রমাণের পরও আর তাহাকে পরীক্ষা করিবার সাহস কাহারও রহিল না, সুধীর জবাবদিহির হাত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া বাঁচিল।

কিন্তু যে ব্যাপারটাকে উপলক্ষ্য করিয়া তাহার এই গৌরব, তাহার অন্তঃসারশূন্যতা তাহাকে ইদানীং বড় পীড়া দেয়। নেশাটা এতদিন শুধু পাগলামিতেই ঠেক্ খাইয়াছিল, এখন তাহা যেন তাহাকে অহর্নিশ খোঁচাইতে শুরু করিয়াছে। অথচ উপায়ই বা কি? মোটে পঁয়তাল্লিশ টাকা বেতন, তাহার মধ্যে চারিটি প্রাণীর ভরণপোষণ এবং ভায়েদের ইস্কুলের খরচা—তাহার মধ্যে ভ্রমণের কথা কল্পনা করাও অসম্ভব!

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাহার মিথ্যাভাষণই তাহাকে অতর্কিতভাবে তাহার এতদিনের বাঞ্ছিত বস্তু মিলাইয়া দিল। কেমন করিয়া তাহাই বলি —

পূজার মাত্র তিনটি দিন বাকী আছে, এমন সময় চাপরাশী আসিয়া সংবাদ দিল, বড়সাহেব সেলাম দিয়াছেন। বড়সাহেবের নামটা শুনিবামাত্র তাহার বুকের ভিতরটা গুরগুর করিয়া উঠিল। তবে কি

কোথাও সে বড় রকমের একটা ভুল করিয়া ফেলিয়াছে? কিন্তু বলির ছাগলের মত কাঁপিতে কাঁপিতে সাহেবের ঘরে প্রবেশ করিয়া যখন দেখিল যে সাহেবের মুখ প্রসন্ন এবং বড়বাবুও হাসি-হাসি মুখে দাঁড়াইয়া আছেন, তখন সে কতকটা সুস্থ হইল। ঘটা করিয়া সেলাম কবিয়া দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিল, হুজুর তলব করেছেন?

সাহেব পরিষ্কার বাংলা বলিতে পারিতেন। কহিলেন, ওয়েল চৌধুরী, বড়বাবু বলছিলেন যে, সারা ভারত তোমার ঘোরা আছে, সব জায়গাকারই খবর তুমি রাখ।

সুধীরের এতক্ষণে ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িল, সে আবারও সেলাম করিয়া কহিল, ঐ সামান্য সামান্য—

সাহেব কহিলেন, আমি ফি-বছবই দার্জ্জিলিং যাই, এবার ঠিক করেছি যে, ইণ্ডিয়াটা একটু দেখব, কোথায় যেতে বলো তুমি আমাকে? Best Sight?

সুধীব ঠিক এ প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না, কিন্তু দেরী করাও মাবাত্মক। সে চট করিয়া কহিল, সাহেব যদি মাপ করেন ত একটা প্রশ্ন করি—

হাঁ, হাঁ, বলো—

শুনেছি সাহেব হিস্ট্রির স্কলার ছিলেন, আপনার কি হিস্ট্রিতে ইন্‌টারেস্ট আছে এখনও?

সাহেবের মুখ উজ্জ্বল হইযা উঠিল। তিনি জবাব দিলেন, Oh enormous!

তাহ'লে আমি বলি সাহেব, ই-আই-আর দিয়ে আগ্রা দিল্লী হয়ে রাজপুতানা ঘুরে আসুন। হিস্টরিক্যালি ইম্পর্টেণ্ট জায়গা অনেকগুলো

দেখা হয়ে যাবে। নইলে 'সাইট' দেখতে গেলে হুজুর, আসাম যেতে হয়, কিন্তু এই কালাজ্বরের টাইম হুজুর, এ সময় ওখানে যাওয়া ঠিক হবে না!

সাহেব কহিলেন, অল্ রাইট্, আমি রাজপুতানাই যাবো। তুমি একটা প্ল্যান ক'রে দাও দেখি, কোথায় কতদিন লাগবে—

একখানা বড় কাগজ ও কলম তাহার দিকে সরাইয়া দিয়া কহিলেন, তুমি বসতে পারো, বোস বড়বাবু—

সুধীরের এ স্থানটায় কোন ভয়ই ছিল না। সে বিস্তৃতভাবে সব বিবরণ, মায় সাহেবদের হোটেল কোন্‌টা ভাল, সুবিধাজনক ট্রেণের সময়, কোথায় কি 'সুভ্‌নির' কিনিতে হইবে সব লিখিয়া দিল। ঘণ্টাখানেক ধরিয়া প্ল্যান তৈরী করিয়া যখন সাহেবের হাতে দিল তখন সাহেব খানিকটা পড়িয়া তাহার অদ্ভুত জ্ঞানের পরিচয়ে খুশী হইলেন। কহিলেন, Thanks চৌধুরী, বড় সুন্দর লিখে দিয়েছ, এইতেই আমার গাইডের কাজ করবে—

তাহার পর সে যখন সেলাম করিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে, সাহেব পুনশ্চ ডাকিয়া প্রশ্ন করিলেন, তুমি কোথায় যাবে চৌধুরী ছুটিতে?

সুধীর মুখ ম্লান করিয়া কহিল, কোথায় যাব স্যার, আমার ওপরই সংসারের সব ভার এখন, মাইনে পাই মোটে পঁয়তাল্লিশটি টাকা, এখন আর কোথাও যাবার উপায় নেই।

সাহেবের চক্ষু দয়ার্দ্র হইয়া উঠিল। কহিলেন, কোথায় যাবার ইচ্ছে হয় তোমার চৌধুরী?

আশা ও আশঙ্কায় সুধীরের বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করিতে লাগিল। সে



বড় সুন্দর লিখে দিয়েছ, এইতেই আমার গাইডের কাজ করবে—

কোন মতে ঢোঁক গিলিয়া জবাব দিল, অনেকদিন কাশী যাইনি হুজুর, বড্ড যেতে ইচ্ছে করে—

আর কোনোও নাম চট্ করিয়া মনে আসিল না।

সাহেব প্রশ্ন করিলেন, কত টাকা হলে তোমার কাশী যাওয়া হয়?

মনে মনে হিসাব করিয়া সুধীর জবাব দিল, অন্তত পঁচিশ টাকা লাগে স্যার।

সাহেব ড্রয়ার খুলিয়া পঁচিশটা টাকা বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া কহিলেন, অল্ রাইট, তুমি ঘুরে এস। তুমি আজই চলে যেতে পার, তোমায় বাড়তি দুদিনের ছুটি দিতে আমি বলে দিচ্ছি বড়বাবুকে।

সুধীর যে সেদিন বাড়ী ফিরিল কি করিয়া তাহা একমাত্র ভগবানই জানেন। কতবার যে মোটরের তলায় পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা তাই। বাড়ীতে যখন সে শেষ অবধি পৌঁছিল, তখন তাহার পাগলের মত উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টি দেখিয়া মা শিহরিয়া উঠিলেন।

কি ব্যাপার রে! এমন চেহারা কেন? অসুখ বিসুখ কিছু করেনি ত?

তাঁহার আসল আশঙ্কা হইল চাকরী সম্বন্ধে, কিন্তু ভয়ে সে কথাটা মুখে পর্য্যন্ত আনিতে পারিলেন না।

কিন্তু সুধীর কহিল, চেহারা? কৈ না, অসুখবিসুখ ত কিছু হয় নি। …তুমি এক কাজ করো দিকি, চট্ করে খানকতক লুচি ভেজে দাও দিকি। আমাকে এক্ষুণি, এই সন্ধ্যের ট্রেণেই একবার কাশী যেতে হবে। অফিসের কাজে—

কাশী যাবি? সে কি? এক্ষুণি—!

হ্যাঁ গো হাঁ, জরুরী কাজ, সাহেব পাঠাচ্ছেন। না গেলে চাকরী থাকবে না। যাও, যাও, দাঁড়িয়ে থেকো না—

তাহার পর সে বিছানা-বাক্স প্রভৃতি লইয়া পাগলের মত টানাটানি শুরু করিয়া দিল ; ভায়েদের একজনকে বলিল, জুতাটায় কালি লাগাইয়া দিতে, আর একজনকে পাঠাইয়া দিল মনোহারী দোকানে। অবশেষে সন্ধ্যা নাগাদ কোনমতে হাঁপাইতে হাঁপাইতে যখন ট্রেণে আসিয়া বসিল, তখন আর তাহার নড়িবার সামর্থ্য নাই—দারুণ উত্তেজনার পরে দারুণ অবসাদ আসিয়াছে। সে কোথায় এবং কি করিতেছে, কোন জ্ঞানই যেন তাহার আর নাই।

বহুক্ষণ গাড়ীর জানালাটায় মাথা রাখিয়া প্রকৃতিস্থ হইবার পর সে চোখ মেলিয়া মুখ বাহির করিয়া দেখিল ট্রেণটা সত্যই চলিতেছে ; কত মাঠ, কত ঘরবাড়ী হু-হু করিয়া চোখের সামনে দিয়া ছুটিয়া চলিয়া যাইতেছে, ঠিক যেমন করিয়া সে এতদিন কল্পনা করিত, তেমনি করিয়াই। সে সত্যই দেশভ্রমণে চলিয়াছে তাহা হইলে !

ভ্রমণ সম্বন্ধে বহুদিনের অভিজ্ঞতার ফলে সে এতদিন পরে জীবনে প্রথমবার ভ্রমণের সুযোগ লাভ করিল।

চাওয়া ও পাওয়া

—অফিসের কাজে অরবিন্দ চলিয়াছে চট্টগ্রাম। সেখানে তিনদিন দেরী হইবে, আর ঠিক তাহার পরেই পড়িবে শিবরাত্রির মেলা। আসিবার সময় একেবারে মেলাটা হইয়া আসিবে এই ছিল তাহার সংকল্প। সুতরাং উৎসাহের তাহার অন্ত ছিল না।

গোয়ালন্দে গাড়ী থামিতেই সে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া স্টিমারে গিয়া উঠিল। ভীড় হইয়া গেলে বড় অসুবিধা হয়, একবার ঢাকা যাওয়ার সময় তাহাকে অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। কিন্তু অত কাণ্ড অত দৌড়াদৌড়ি সত্ত্বেও স্টিমারে পৌঁছিয়া দেখিল যে ডেকটা ইতিমধ্যেই ভরিয়া গিয়াছে, বুদ্ধিমান লোকেরা আগের দিনের ঢাকা মেলে আসিয়া যতটা সম্ভব স্থান দখল কবিয়া বসিয়া আছে। তাহাদের বিছানা সরাইতে গেলে বিবাদ করিতে হয়। অত হাঙ্গামা না করিয়া অন্য কোথাও নিরাপদ স্থান পাওয়া যায় কিনা ভাবিতেছে, এমন সময়ে হুড়মুড় করিয়া যাত্রীদল আসিয়া পড়িল। কে কার ঘাড়ে পড়িল কিংবা কাহার সুটকেশ কাহার নিকট গিয়া উপস্থিত হইল তাহা কিছুই ভাল করিয়া বুঝা গেল না কিন্তু সেই গণ্ডগোল চেঁচামেচির মধ্যেই অরবিন্দর একটা সুযোগ মিলিয়া গেল। সে বার-দুই-তিন হোঁচট খাইয়া কোন মতে একেবারে রেলিংয়ের কাছে গিয়া পৌঁছিল এবং সেখানে যে হাত-দুই প্রমাণ খালি জায়গা পড়িয়াছিল তাহাতেই নিজের বিছানাটা বিছাইয়া সুটকেশ ঠেস্ দিয়া বসিয়া পড়িল।

এই ধাক্কাধাক্কির ধাক্কা সামলাইতে তাহার কিছু সময় লাগিল। অবশেষে যখন খানিকটা সুস্থ হইয়া সে সিগারেট ধরাইল তখন গোলমাল অনেকখানিই মিটিয়া গিয়াছে, সকলেই অল্প-বিস্তর স্থান সংগ্রহ করিয়া তখন কয়েক ঘণ্টার গৃহস্থালী পাতিতে ব্যস্ত। আর ভীড় নাই, দুই একজন লোক তখনও যা মধ্যে মধ্যে আসিতেছিল তাহারা নিতান্ত স্থানীয় লোক, তাহাদের জন্য কাহারও অসুবিধা হয় না।

এইবার সে তাহার প্রতিবেশীদের দিকে মনোযোগ দিল। তাহাব ঠিক ডানপাশে একদল বৰ্দ্ধমান জেলার লোক বস্তায় করিয়া জিনিষপত্র, থালায় করিযা ভিজা চিঁড়া এবং মাথা পিছু বোধ করি গোটা-দুই হিসাবে হুঁকা লইয়া স্থানটাকে নরককুণ্ড করিয়া তুলিয়াছে। বাঁ, পাশে উঠিযাছে একদল রংপুরের লোক কিন্তু তাহাদের দিকেও একবাবেব বেশী তাকাইবার প্রয়োজন হয না। এই দীর্ঘ পথটা দৃষ্টিকে একটু আনন্দ নিতে পারে এমন কেহ আছে কিনা এই খোঁজে সহযাত্রী এবং বিশেষ করিযা সহযাত্রিনীদের উপব দিযা মোটামুটি একবার চোখ বুলাইতে বুলাইতে সহসা এক জাযগায আসিয়া তাহার দৃষ্টি একেবারে থামিয়া গেল। বযলারের ধার ঘেঁষিযা একদল যাত্রী আশ্রয় লইয়াছে কিন্তু ভাল কবিয়া বিছানা বিছাইবার মত স্থান পায় নাই বলিয়া তাহাদেরই মধ্যে একটি আঠারো উনিশ বছরের মেয়ে একটা টিনেব সুটকেশের উপব বসিযাছিল। মেয়েটি রূপসী বলিলে যদি বা কিছু অত্যুক্তি করা হয—সুশ্রী বলা চলে অনায়াসেই। খুব সম্ভব বিবাহিতা, কারণ কপালের অৰ্দ্ধেকটা পৰ্য্যন্ত ঘোমটা টানা রহিয়াছে। কিন্তু অরবিন্দ চমকিয়া উঠিয়াছিল অন্য কারণে—সেই তরুণীটি ঘোমটার মধ্য হইতে আয়ত দুটি চক্ষু মেলিয়া একদৃষ্টে চাহিয়াছিল—তাহার দিকেই।



একটি আঠারো উনিশ বছরের মেয়ে একটা টিনের সুটকেশের উপর বসিয়াছিল।

তাহার সহিত চোখোচোখি হইতেই মেয়েটি তাড়াতাড়ি চোখ নামাইয়া লইল। কিন্তু যেটাকে অত্যন্ত বিরক্তিকর আবহাওয়া বলিয়া বোধ হইতেছিল তাহারই মধ্যে দৈবাৎ এই রোমান্স-এর গন্ধ পাইয়া অরবিন্দ যারপরনাই পুলকিত হইয়া উঠিল। তাহার বয়স আঠাশ,

এখনও পর্য্যন্ত বিবাহ হয় নাই, নভেল পড়ে ও বায়স্কোপের ছবি দেখে প্রচুর—সুতরাং এ পুলক তাহার মার্জ্জনীয়।

সে সোজা হইয়া বসিল। সিগারেটটা অনেকটা পুড়িয়া গিয়াছিল বলিয়া খানিকটা থাকিতেই সেটা পদ্মার বুকে ফেলিয়া দিয়া নূতন একটা ধরাইল। তাহার পর খবরের কাগজখানা পড়িবার মত করিয়া মেলিয়া ধরিয়া মেয়েটির দিকে ভাল করিয়া চাহিবার সুবিধা করিয়া লইল। কিন্তু সে যেন তাহার চক্ষুকে ভাল করিয়া বিশ্বাস করিতে পারিল না, মেয়েটি আবারও তাহার দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে! তবে কি পৃথিবীতে রোমান্স দুর্ল্লভ নয়, এখনও পথে ঘাটে মেলে?

তরুণীর সঙ্গে একটি বৃদ্ধা ও একটি মধ্যবয়সী বিধবা স্ত্রীলোক ছিলেন। হয়ত মা ও দিদি হইবেন। আর ছিল বছর বাইশ-তেইশের একটি ছোকরা এবং একটি অত্যন্ত নাবালক ছেলে। পরিবারটিকে দেখিলেই মনে হয় ইহারা ভদ্র ঘরের এবং শহরের লোক, খুব সম্ভব চন্দ্রনাথেই চলিয়াছেন।

আরও একবার অতর্কিতে দুজনের দৃষ্টি মিলিতেই মেয়েটি অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া চোখ নামাইয়া লইল। কিন্তু লজ্জায় তাহার সুন্দর গাল দুইটিতে যেন লালিমা ফুটিয়া উঠিল, তাহাতেই অরবিন্দের বুকের স্পন্দন বাড়িয়া গেল। সে নার্ভাস হইয়া পড়িয়া সিগারেটটা নূতন জামায় ফেলিয়া দিয়া অনেকখানি পোড়াইয়া ফেলিল।

ইহার পর আর অরবিন্দের কোন দিকে কোন খেয়াল রহিল না। মেয়েটি যে সুবিধা পাইলেই বিশেষ করিয়া তাহারই দিকে কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছে তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। স্থান-কাল পাত্রও ও প্রণয়লীলার পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল। স্টিমারের উপর অপরাহ্ণ-

বেলায় এক রহস্যময়ী সুন্দরী অপরিচিতার দৃষ্টি আকর্ষণ করার সৌভাগ্য সে যে এমন অনায়াসে লাভ করিবে, ইহা ছিল তাহার কল্পনাবও অতীত। তাহা হইলে নভেলে যা লেখে তাহা একেবারেই অসম্ভব নয় !

কিন্তু মেয়েটি যে বড় দূব। চারিদিকে অসংখ্য যাত্রী এবং উজ্জ্বল আলো, আলাপ কবার কোন সুযোগই চোখে পড়ে না। গল্প-লেখকরা কেমন এসব ক্ষেত্রে তাহাদের নায়কের জন্য সুযোগ-সুবিধা করিয়া দেন, বাস্তবে কি তাহার একটারও দেখা মেলে না ছাই ! অববিন্দ তাহার বুদ্ধির দ্বারে বাববাব মাথা কুটিতে লাগিল কিন্তু কোনও উপায়ই খুঁজিয়া পাইল না।

ইতিমধ্যে সে লক্ষ্য করিল যে, মেয়েটির মাও যেন তাহাকে লক্ষ্য করিতেছে। কী-যেন অস্ফুটস্বরে মা ও মেয়েতে বলাবলিও একটা হইয়া গেল, ফলে মেয়েটির গালে আবারও আপেল ফুটিয়া উঠিল।

কাগজ পড়িবার ছলে মুগ্ধ দৃষ্টিতে অরবিন্দ সেই দিকে চাহিয়া আছে এমন সময় তাহার এতক্ষণের বাঞ্ছিত সুযোগ মিলিয়া গেল। ছোট ছেলেটি একটা ঘটি হাতে করিয়া অতিকষ্টে ভীড়ের মধ্য দিয়া পথ করিয়া করিয়া চলিয়াছে কলের দিকে, নিশ্চয়ই জল আনিতে যাইতেছে। ...বাঃ—এইত সুযোগ। অরবিন্দ অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল ছেলেটির ফিরিবার এবং বহু দূরে তাহাকে দেখা যাইতেই সে কাগজটা রাখিয়া উঠিয়া পড়িল।...

ছেলেটি ফিরিতেছে এবং সে যাইতেছে বাথরুমের দিকে, হঠাৎ তাহারই ধাক্কা লাগিয়া ঘটিটা পড়িয়া গেল এবং খানিকটা জল গিয়া লাগিল আর এক ভদ্র লোকের বিছানায়। তিনি কি কটূক্তি করিতে লাগিলেন সেদিকে কান না দিয়াই সে বলিয়া উঠিল, মাপ করবেন স্যার,

ইস্ খোকা, তোমার সব জলটা পড়ে গেল, না ?···দাঁড়াও, আমিই এনে দিচ্ছি, কোনখানে আছ তোমরা ?···ঐখানে, আচ্ছা তুমি যাও, আমি জল পৌঁছে দেব—

ছেলেটির কোন প্রতিবাদে কর্ণপাত না করিয়া সে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল কলের দিকে। কিন্তু এক ঘটি জল লইয়া যখন সে ফিরিয়া আসিল তখনও ছেলেটি পথের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছে, সে হাত বাড়াইয়া কহিল, দিন আমিই নিয়ে যাচ্ছি—

অরবিন্দ বিব্রতভাবে মুহূর্ত্তখানেক ইতস্তত করিয়া কহিল, না, না তোমার হাতে আর দেওয়া উচিত নয়, তুমি হয়ত আবারও ফেলে দেবে। চল আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি—

ছেলেটির সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া সে ঘটিটা সামনে নামাইয়া রাখিযা বড ভাইকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, খোকা ঘটিটা ফেলে দিয়েছিল পথে, সেই জন্যে আমি আব ওর হাতে দিইনি, নিজেই নিয়ে এলুম—

ছেলেটি যেন কী একটা বলিতে চেষ্টা করিল, তাহাকে ধন্যবাদ মনে করিয়া অরবিন্দ রুমালে হাত মুছিতে মুছিতে কহিল, না, না, **that's all right!** ···ফেলো প্যাসেঞ্জার আমরা, একটু কো-অপারেশন থাকা দরকার বৈকি।

সে আর কোনও সুবিধা না পাইয়া ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছে এমন সময় মেয়েটির মা মাথার কাপড়টা সরাইয়া দিয়া কহিলেন, বাবা ধীরেন, শোন—

অরবিন্দ কৃতার্থ হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আপনারা বোধ হয় আমার সঙ্গে আর কাউকে ভুল করছেন। আমার নাম অরবিন্দ,

শ্রীঅরবিন্দ বসু,…কিন্তু তা হোক, তাতে কোন ক্ষতি হয় নি—কী বলছিলেন বলুন—

কিন্তু তিনি যাহা বলিলেন তাহাতে অকস্মাৎ অরবিন্দর মুখের হাসি মিলাইয়া গেল। তিনি কহিলেন, নাম তুমি যা বলতে চাও বলো কিন্তু একটা কথা তোমাকে আজ একবার মুখোমুখি জিজ্ঞাসা করবো বাবা—আমার এমন সোনার প্রতিমা মেয়েকে তুমি কি অপবাধে ত্যাগ করলে বাবা ধীবেন! আমাদের যদি কোন অপরাধই হয়ে থাকে ত আমাদেরই তুমি শাস্তি দিলে না কেন?

মেয়েটি লজ্জায় যতদূর সম্ভব মাথা নত করিয়া বসিযাছিল, কিন্তু অকস্মাৎ মজাব গন্ধ পাইযা চারিপাশের সহযাত্রী ও সহযাত্রিনীব দল ঝুঁকিয়া পড়িল।‥ এতগুলি লোকেব কৌতূহলী দৃষ্টিব সম্মুখে অববিন্দ ঘামিয়া উঠিল।‥ এ আবাব কী বিপদ!‥

সে বিব্রতভাবে কহিল, আপনাবা ভয়ানক ভুল কবছেন, আমাব এখনও বিয়েই হয়নি যে।‧ তা ছাড়া আমাব নাম সত্যই অববিন্দ, অববিন্দ বোস।

মাযেব গলা এবাব একটু চড়িল। তিনি কহিলেন, বিয়েব পব আর তোমায় দেখিনি বটে কিন্তু তাই ব'লে নিজের জামাইকে চিনতে পারা যায় না, এত চাল্‌সে ত আমার ধরেনি বাবা! তা ছাড়া যাব স্বামী সে ত ভুল করবে না, ঐ ত আমায় আগে দেখালে—! মাথা তোল্‌ মা সরমা, এ লজ্জার সময় নয়, কিসের জন্যে এত বড় সর্ব্বনাশ ও করলে, সেই কথাটা একবার খোলাখুলি জিজ্ঞেস ক'রে নে—

অরবিন্দ এবার বিরক্ত হইয়া কহিল, এ-ত আচ্ছা বিপদ হ'ল দেখছি।

বল্‌ছি যে আমি এখনো বিয়ে করিনি, আমার ও নাম নয়, তবু আপনারা একটা পরস্ত্রী আমার ঘাড়ে চাপাতে চান!

বর্দ্ধমানের দলের ঠিক ওপাশে একটি বিরাটকায় পুরুষ উঠিয়াই শুইয়া পড়িয়াছিলেন, তিনি এবার উঠিয়া আসিয়া জলদ্‌গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, ব্যাপার কী মশাই, শুনতে পারি না?

'মশাই' কেহ জবাব দিলেন না, কিন্তু সরমার মা মাথার কাপড়টা আর একটু নামাইয়া দিয়া কহিলেন, কী আর শুনবেন বাবা, এইটি আমাব জামাই। আমাদের বাড়ী হ'ল চন্দননগর, এদের বাড়ী গোঁদল্পাড়ায়—বিয়ের ঠিক আটদিন পরে জোড়ে আমাদের বাড়ী এসেই হঠাৎ ভোরবেলা কোথায় উধাও হ'ল আর ফিবে এল না। একে ত আমাদের দুঃখ, মেয়ের আমার মুখের দিকে চাইতে পারি না, তার ওপর বেযানের কাছে মুখ দেখানো বন্ধ, তারা প্রত্যেকে আমাদেব দোষ দিচ্ছে, ভাবছে আমরাই কি মন্দ করেছি! তাই এতদিন পরে দেখা হ'তে একবার শুধু জানতে চাইছি আমাদেব অপরাধটা কি, কেন এমনটা করলে ও!

চারিদিক হইতে একটা অস্ফুট গুঞ্জন উঠিল। ছিঃ ছিঃ, কী প্রবৃত্তি, মানুষ না কি? ভদ্রসন্তান, লেখাপড়া শিখে এমন চামার হয! · ছি! ইত্যাদি—

সেই মোটা লোকটি দুই কনুই দিয়া ভীড় ঠেলিয়া সামনে আসিয়া কহিলেন, দাও না হে ছোকরা, জবাব দাওনা, চুপ ক'রে রইলে কেন?

অরবিন্দের এবার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল, সে বেশ ঝাঁঝের সঙ্গেই জবাব দিল, জবাব দিই, না দিই আপনার কি? আপনি মোড়লি করতে এসেছেন কেন? একশো বার বলছি যে আমি এদের চিনি না, এখনও

বিয়ে করিনি, আমার ও নাম নয়—না সবাই মিলে আমাকে শাসন করতে এলেন! যান্, আপনাদের জায়গায় যান—

মোটা লোকটির মুখ-চোখের চেহারা ভীষণ হইয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, আমি নিজের জায়গায় যাব, আমি মোড়লি কবি কেন? জানো ছোকরা আমি কে ?···ইচ্ছে করলে একটি দিনেব ভেতর তোমাব ও ভিরকুটি বন্ধ করতে পারি, তা জানো ?···জানো আমার তিন ভাই পুলিশে কাজ করে ?

অরবিন্দ জবাব দিল, তা জানি না, তবে এটুকু জানি যে স্টিমারের ওপরেও পুলিশ আছে, আর আপনারা আমাকে অযথা বিবক্ত কবছেন ব'লে আমিও পুলিশ ডাকতে পারি।

সে ভদ্রলোক উষ্ণ কণ্ঠে কহিলেন, অযথা মানে ?·· এ মেয়েটি তোমার স্ত্রী নয় ?

অরবিন্দ কহিল, না।

তবে বাবা তুমি স্টিমারে উঠে ইস্তক্ একদৃষ্টে ওর দিকে চেয়েছিলে কেন? চালাকি পেয়েছ! ভেবেছ আমরা কেউ দেখিনি! তুমিও উঠেই চিন্‌তে পেরেছিলে।

ঠিক এই আঘাতটার জন্য অববিন্দ প্রস্তুত ছিল না, সে মিনিট-খানেক কোন জবাবই দিতে পারিল না। বক্তা ইত্যবসবে বিজয়গর্ব্বে একবার উপস্থিত সকলের দিকে চোখ বুলাইয়া লইলেন! চাবিদিকে আরও একবার অস্ফুট গুঞ্জন উঠিল। আর একটি ভদ্রলোক কহিলেন, সত্যি মশাই, যদি ইনি আপনাব বিবাহিতা স্ত্রী-ই হন তা হ'লে আপনার এ রকম ব্যবহারের অর্থ কি ?

অরবিন্দ বিব্রত হইয়া কহিল, আপনারা সবাই আমার সঙ্গে

লাগলেন যে, অফিসের কাগজপত্র রয়েছে দেখুন না, আমার নামে অফিস থেকে চিঠি দিয়েছে, তাতে কী নাম লেখা রয়েছে তাও দেখুন না! মিছিমিছি আপনারা আমাকে দুষছেন কেন?

সরমার মা এতক্ষণ চুপ করিয়া উদ্বিগ্নভাবে দাঁড়াইয়া ছিলেন; তিনি কহিলেন, তুমি যখন বাপ-মা-স্ত্রী সব ত্যাগ করেছো তখন কী আর নামটা ত্যাগ করোনি। কিন্তু অগ্নি সাক্ষী করে যাকে বিয়ে করেছ তুমি, সে-ত তোমাকে ভুল করবে না বাবা! জিজ্ঞেস করুন-না আপনারা, আমার মেয়েকেই জিজ্ঞেস করুন না!

মোটা লোকটি আর দুই-তিন ইঞ্চি অগ্রসর হইয়া আসিয়া সরমার উদ্দেশে প্রশ্ন করিলেন, কেমন গো মা লক্ষ্মী, এই লোকটাই তোমার স্বামী ত? বেশ ভাল ক'রে ভেবে-চিন্তে জবাব দাও, এ লজ্জা করার সময় নয়। ভাল ক'রে চিনতে পেরেছ ত?

মেয়েটি মাথা তুলিল না বটে কিন্তু ঘাড় নাড়িয়া জানাইল যে সে চিনিতে পারিয়াছে। মোটা ভদ্রলোকটি একটা হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন, চালাকি! হিন্দুর মেয়ে স্বামী ভুল করবে!···না, না, ওসব মৎলব ছাড় ছোকরা, এর একটা ব্যবস্থা না ক'রে ছাড়ছিনা, এটা স্থির জেনে রেখো—

অরবিন্দ কঠিন কণ্ঠে কহিল, তার মানে?···বেশ যদি আমার স্ত্রীই হয়, আমি যদি ওকে না নিই—আপনারা গায়ের জোরে কিছুই করতে পারেন না জানেন? এক খোরপোষের দাবী চলে, তাও আদালতে নালিশ করতে হয়। আমার বাজে বকবার সময় নেই, আমি চললুম।

সে নিজের জায়গায় গিয়া বসিল—একেবারে সরমাদের দিকে পিছন

ফিরিয়া এবং নদীর দিকে মুখ করিয়া। কাগজটাও চোখের সামনে মেলিয়া ধরিল, যদিও লেখার একটি বর্ণও তাহার হৃদয়ঙ্গম হইল না।

মোটা লোকটি কিন্তু হাল ছাড়িলেন না। তিনি উপস্থিত অন্যান্য ভদ্রলোকদের সঙ্গে দল পাকাইয়া উত্তেজিত ভাবে ইতিকর্ত্তব্য আলোচনা করিতে লাগিলেন। একটা যে কিছু করা প্রয়োজন এটা নিশ্চিত, এত বড় পাষণ্ডকে এম্‌নি ছাড়িয়া দেওয়া কিছুতেই চলিতে পারে না। অথচ কীই-বা করা যায়, ছোকরা আবার আইন দেখায় যে।

ক্রমে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। সরমার মায়ের বিলাপ তখনও থামে নাই। মোটা ভদ্রলোকটির উত্তেজনাও সমানে চলিয়াছে। তিনি স্থির করিয়াছেন যে যেমন করিয়াই হউক চাঁদপুরে স্টিমার থামিলে ছোকরাকে তিনি শিক্ষা দিয়া দিবেন। আর সবাই যদি ভয় পায় ত তাহারা যেন সরিয়া পড়ে কিন্তু তাঁহার ভয়ডর নাই, তাঁহার তিন ভাই পুলিশে চাকরী করে, আইন তিনিও জানেন। আর এতবড় পাষণ্ডকে শাস্তি দেওয়ার জন্য যদি আইন তাঁহাকে ধরে ত ধরুক!

অরবিন্দ ভাবিতেছে তাহার রোমান্সের কথা। স্টিমারে এক তরুণীর সহিত রোমান্স করিতে যাওয়ায় যে এত বিপদ তা কে জানিত!

সরমার মা চুপি চুপি এক ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, চাঁদপুরে নেমে ওর মাকেই একটা জরুরী তার পাঠিয়ে দিই, কী বলেন? তাদের ছেলে তারা বুঝুক!

তিনি পরামর্শ দিতেছেন, হ্যাঁ, তাই করুন আর পুলিশকেও না হয় একটা খবর দিলে হয়! স্বদেশী মামলার ফেরারী বললে কী হয়?

সরমার মা শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন, না, বাবা, যদি জেল টেল হয়। ওর অফিসের নামটাও পেলে হ'ত যে!

এই সব পরামর্শ অরবিন্দর কানে সবগুলিই পৌঁছিতেছিল। কী বিপদেই ভগবান তাহাকে ফেলিলেন। সত্যই যদি চাঁদপুরে একটা থানা-পুলিশ কেলেঙ্কারী বাধায় ইহারা? মোটা লোকটি ত মারপিটের জন্যও প্রস্তুত। ছি-ছি, এই সব ব্যাপার লইয়া জানাজানি হইলে আর মুখ দেখাইবার উপায় থাকিবে না। অফিসের জরুরী কাজটাও মাটি হইবে, সাহেবকেই বা সে কী কৈফিয়ৎ দিবে?

সে শীতের রাত্রেও ঘামিয়া উঠিল।

কানে গেল, মোটা লোকটি কাহাকে ডাকিয়া তাঁহার বাক্স-বিছানা, ঘড়ি প্রভৃতি জিম্মা করিয়া দিতেছেন, অর্থাৎ সমস্ত রকম হাঙ্গামার জন্যই তিনি প্রস্তুত।

কিন্তু তাহার পূর্ব্বে একটা কথা অরবিন্দের মাথায় গেল। সে তড়াক্ করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া সরমার মায়ের সামনে আসিয়া কহিল, আচ্ছা আপনার মেয়ে ত এতদিন পরে আমাকে দেখে চিনতে পেরেছেন, তার মানে স্বামীকে তিনি তখন ভাল ক'রেই দেখেছিলেন। ···আচ্ছা ওঁকেই জিজ্ঞেস করুন দিকি, এমন কোন শারিরীক চিহ্ন তাঁর ছিল কিনা, যাতে নিশ্চয় প্রমাণ হ'তে পারে যে আমিই সেই লোক!

মুহূর্ত্ত মধ্যে আবার সকলে ভীড় করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। একজন কহিল, ঠিক! ন্যায্য কথা!

সরমার মা সরমাকে প্রশ্ন করিলেন, বল্ না, মনে পড়ে এমন কোন চিহ্নের কথা!

মিনিট-খানেক নিঃশব্দে ভাবিয়া সরমা চুপি চুপি মায়ের কানে কানে কি কহিল। সরমার মা কহিলেন, ও বলছে যে ডান কনুয়ের কাছে তোমার একটা মস্ত বড় পোড়া দাগ ছিল।···আমারও এখন মনে পড়ছে—

নিমেষের মধ্যে পাঞ্জাবীর হাতা গুটাইয়া অরবিন্দ তাহার সুগোল শুভ্র,নিষ্কলঙ্ক হাত জাহাজের আলোর নীচে মেলিয়া ধরিল। তাহাব পব সেই হতভম্ব মোটা ভদ্রলোকটির দিকে চাহিয়া ঈষৎ বিদ্রূপ-মাখানো কণ্ঠে কহিল, কী, পুলিশ ডাকছিলেন না?

জামাই চাই

প্রথমা দুইটি কন্যাকে তবু আঠারোর ওধারেই পার করিয়াছিলাম কিন্তু তৃতীয়া বাইশ বছরেও একেবারে অচল হইয়া বসিয়া রহিলেন। আত্মীয়স্বজনকে এখনও বলি সতেরো-আঠারো—বন্ধুবান্ধবকে বলি ষোলসতেরো, কিন্তু ভিতবে ভিতরে দুশ্চিন্তায় শুকাইয়া উঠি। তাহার উপর ওপক্ষ হইতে কোন সহানুভূতি নাই। তিনি নিত্য আমাকেই অনুযোগ কবেন, কী ক'রে এমন নিশ্চিন্ত হয়ে আছ? আমি যে আর লোকেব কাছে মুখ দেখাতে পারি না। আমাকে গলায় দড়ি দিতে দেখলেই কি তোমার সুখ ষোলকলা পূর্ণ হয়?

প্রায়ই উত্তর দিই না, একদিন খালি বলিযা ফেলিয়াছিলাম, এখন আব গলায় দড়ি দিয়ে লাভ কি, টুটু জন্মাবার আগে যদি সেটা বিবেচনা ক'রতে তাহ'লে না হয় কন্যাদায়ের দুর্ভাবনা থেকে রেহাই পেতুম।

বলা বাহুল্য, ইহার পর প্রায় দিন-ছয়েক তিনি আমার সহিত বাক্যালাপ করেন নাই। অথচ পাত্র যে জোটে না—তাহা আমার দোষেও নয়, মেয়ের দোষেও নয়, নিতান্তই আমাদের ভাগ্যের দোষে। টুটু দেখিতে ভালই, মাজা মাজা রং, গড়ন-পেটন—মেয়েলি ভাষায় যাহাকে বলে—বেশ থোড়ের মতন, মুখশ্রীও নিতান্ত মন্দ নয়, কেবল দোষের মধ্যে চোখ দুইটি পরস্পরের একটু কাছাকাছি। মানে, একটু বেশী কাছাকাছি। কিন্তু উহার চেয়ে অনেক কুৎসিৎ মেয়ে বিনা বাধায়

পার হইতে দেখিয়াছি। আমারও চেষ্টার ক্রটী নাই, মেয়ে দেখাইয়া এবং ছেলে দেখিয়া একেবারে হয়রাণ হইয়া গিয়াছি। জলখাবারের খরচ মাসিক তিন টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল, এখন আর খাবার খাওয়াই না, শুধু চা ও পানের উপর দিয়াই সারিয়া দিই।

এই যখন অবস্থা তখন গৃহিণীই সহসা একদিন দুর্ব্বুদ্ধি জাগাইলেন, সন্ধ্যাবেলা ঘরে ঢুকিয়া কহিলেন, ওগো শুনছ—এক কাজ করো দিকিন, আনন্দবাজারে একটা বরং বিজ্ঞাপন দিয়ে দাও। প্রায়ই ত দেখি 'পাত্র চাই' ব'লে থাকে। ফল না পেলে কি আর এত লোকে দেয় ?

মুখে একটা ক্ষীণ প্রতিবাদ করিলাম, সবাই কি আর অপবেব কাছ থেকে জেনে দেয়, ফলের আশাতেই লোকে দেয়, আমাদেব মত জ্বালায় প'ড়ে।

কিন্তু কথাটা প্রাণে লাগিল। পরের দিন অফিসে গিয়া আব কোন কাজই করিতে পারিলাম না, সমস্ত ক্ষণটা বসিয়া বসিয়া বিজ্ঞাপনেব মুসাবিদা করিল্যম এবং সাড়ে চারিটা বাজিবার পূর্ব্বেই বডবাবুকে বলিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। আনন্দবাজার অফিসে গিয়াও আবাব খসড়াটা কিছু পাল্টাইতে হইল, অবশেষে অনেক ঘষামাজার পর দুইটি টাকা জমা দিয়া আসিয়া দুরু দুরু বক্ষে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। বাত্রি প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে স্বামী-স্ত্রী দু'জনেরই অবস্থা কাহিল। ভোর হইতেই আমি বাহিরে গিয়া নগদ তিন পয়সা খরচ করিয়া একখানা কাগজ কিনিয়া আনিয়া দেখি তিনিও তাঁহার ছেলেকে দিয়া একখানি কাগজ ইতিমধ্যে কিনিয়া আনাইয়াছেন। ইহার পর বিজ্ঞাপনটিকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া নানাভাবে পড়িতে এবং অন্যান্য 'পাত্র চাই' বিজ্ঞাপনের রচনার মুন্সিয়ানার সহিত মিলাইয়া দেখিতেই

সকালটা কাটিয়া গেল, কোনমতে দুটি ভাত মুখে গুঁজিয়া অফিসে গিয়া যখন পৌঁছিলাম, তখন মনে বেশ ভরসা আসিয়াছে যে, এবারে হয়ত টুটুকে পাত্রস্থ করিতে পারিব। বেচারী টুটু, সে কাল হইতে লজ্জায় আমার সামনে আসাই ছাড়িয়া দিয়াছে।

দুই তিন দিন পরেই চিঠি আসিতে শুরু হইল। গৃহিণীর কথাই ঠিক, বিজ্ঞাপনে 'ফল' যথেষ্টই হয়। চিঠি দেখি প্রত্যেক ডাকেই তিন-চারখানা করিয়া আসে। কিন্তু তাহাদের কাহারও কন্যা-সম্বন্ধে কোন দুশ্চিন্তা নাই, প্রত্যেকেই জানিতে ইচ্ছুক যে বিজ্ঞাপনে 'যৎসামান্য পণের' কথা লেখা থাকিলেও ঠিক কতটা টাকা খরচ করিবার আমার সাধ্য আছে। কেহ বি-কম, পাস করিয়া বসিয়া আছেন, ব্যবসা করিতে ইচ্ছুক, হাজার চারেক টাকা পাইলে একটা পোল্ট্রির ব্যবসা করিতে পারেন। বাঙ্গালী শুধু ভাল হিসাব রাখিতে অক্ষম বলিয়াই কেমন করিয়া ব্যবসা নষ্ট করে, তিনি সেই সম্বন্ধে বিস্তর নজীর দেখাইয়া লিখিয়াছেন যে, আমি যদি ঐ টাকাটা এবং আমাব কন্যাকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করি তাহা হইলে তিনি চাইকি ব্যবসা করিয়া বৎসর তিন-চারের মধ্যেই টাকাটা আমাকে প্রত্যর্পণ করিতে পারেন। শ্বশুরের পয়সায় বড়লোক হইবার ইচ্ছা তাঁহার নাই—ইত্যাদি।

কেহবা মেডিকেল কলেজে পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়েন, ইতিমধ্যে একবারও ফেল করেন নাই এই নজীর দিয়া লিখিয়াছেন যে বিধান রায় ও নীলরতনের খ্যাতি ম্লান করিবার মত প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এ অবস্থায় যদি বিলাত যাইতে তিনি না পারেন তাহা হইলে উহা জাতিরই দুর্ভাগ্য বুঝিতে হইবে। সেই শোচনীয় পরিণতির

হাত হইতে জাতিকে আমি রক্ষা করিতে প্রস্তুত আছি কি না, তিনি তাহাই জানিতে চান।

এক্জন ইন্সিওরেন্স কোম্পানী খুলিয়া ফেলিয়াছেন, এখন কিছু বিপন্ন। কিন্তু মাত্র তিন-চার হাজার টাকা পাইলেই তিনি ঐ কোম্পানীকে 'প্রথম শ্রেণীর বীমা প্রতিষ্ঠানে' পরিণত করিতে পারেন, অতএব—। আর একজন অফিসে চাকরী করেন, সামান্য একটু জমিও খরিদ করিয়াছেন, এক্ষণে যদি কেহ উক্ত জমির উপর একটা ছোটখাট মাথা গুঁজিবার মত আশ্রয় করিয়া দিতে পারে তাহা হইলে তিনি সেই উদার ব্যক্তির কন্যাদায় উদ্ধার করিতে পারেন।

একটি লোক খালি বিনা পণেই আমার কন্যাকে উদ্ধার করিতে ঔৎসুক্য জানাইয়াছেন, তবে এটি তাঁহার তৃতীয় পক্ষ হইবে। অবশ্য ঐ নামেই তৃতীয় পক্ষ, বয়স তাঁহার বেশী নয়, মাত্র চল্লিশ। দুইটি পক্ষ মিলাইয়া সন্তান মাত্র তিনটী তাহাদেরই একটি জননী তিনি খুঁজিতেছেন। উপার্জ্জন করেন ভাল, স্বাস্থ্য আরও ভাল কেবল মাথার চুলগুলি পাকিয়াছে কিন্তু সে নাকি তাঁহাদের বংশে ষোল বৎসরেই পাকে। দাঁত দু'টি তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক তোলাইয়াছেন, নহিলে এখনও বেশ শক্তই আছেন। ইত্যাদি—

গৃহিণী কটূক্তি করিয়া কহিলেন, বাহাত্তুরে বুড়ো, কেমন ইনিয়ে বিনিয়ে লিখেছে দেখ না, ও নিশ্চয় আমার বাবার বয়সী—এই আমি বলে রাখলুম!

কিন্তু তাহাতে সান্ত্বনা কি? অন্ধকার পূর্ব্বেও যেমন ছিল, এখনও ঠিক তেম্‌নিই রহিল। মিছামিছি দুইটি টাকাই খরচ হইল। তৃতীয় পক্ষের বাবাজী চিঠির মধ্যে করিয়া জবাবের প্রত্যাশায় একখানা

ডাকটিকিট দিয়া দিয়াছিলেন সেইটিই গৃহিণীর হাতে দিয়া কহিলাম, এইটে তুলে রাখো, তবু এক আনা পয়সা উসুল হ'ল, যথা লাভ!

ইহার পর নিশ্চিন্ত হইয়া অফিস করিতে লাগিলাম। আর আশা নাই, সুতরাং আকাঙ্ক্ষাও নাই; চিঠিগুলি আজকাল আর খুলি না, মধ্যে মধ্যে আমার চতুর্থী মিনি পড়িয়া শোনায় মাত্র। কিন্তু সহসা একদিন চিঠির বদলে পাত্রই আসিয়া উপস্থিত হইল।

আবার ঘটক-ঘটকীর খোসামুদী কবিব কিম্বা গৃহিণীর কথামত কোন আধুনিক বিবাহ অফিসে নাম লিখাইব, এই কথাটাই একটা রবিবার বাহিরের ঘরে বসিয়া চিন্তা করিতেছি এমন সময় কানে গেল পাশের বাড়ীতে কে খোঁজ করিতেছে, হ্যাঁ মশাই, এইটে কি তেরব এক নম্বর?

ব্যস্ত হইয়া জানালা দিয়া উঁকি মাবিয়া দেখিলাম, চমৎকাব গেরুয়া বঙের কাছা-খোলা কাপড় ও পাঞ্জাবী পরা এক তরুণ সন্ন্যাসী। বিস্ময়েব সামা বহিল না, আমার কাছে এমন আধুনিক নবীন সন্ন্যাসীর কি প্রয়োজন থাকিতে পারে?

কিন্তু বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না, পাশের বাড়ী হইতে সন্ধান পাইয়া তিনি আমার বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং নম্বরটায় চোখ বুলাইয়া সটান্ ঘরের মধ্যে উঠিয়া আসিয়া চৌকীটার উপব বসিয়া পড়িলেন। আমার নিমন্ত্রণের অপেক্ষা ত বাখিলেনই না, এমন কি আমাকে কোন প্রকার প্রশ্ন করাও আবশ্যক বিবেচনা করিলেন না। চাঁদা চাহিবার আশঙ্কায় বিবর্ণ হইয়া নিজেই প্রশ্ন কবিলাম, কাকে চাই আপনার?

তিনি একটা তাকিয়ায় ঠেস দিয়া, বোধ করি পথশ্রমেই, চোখ

বুজিয়া ছিলেন, এখন চোখ মেলিয়া চাহিয়া কহিলেন, আপনার নামই বোধ হয় শৈলেন রায় ? নমস্কার।

প্রতি নমস্কার করিয়া কহিলাম, আজ্ঞে হ্যাঁ, কিন্তু কী দরকার আপনার ?

স্মিত হাস্যে তিনি কহিলেন, বসুন, ব্যস্ত হবেন না। তাড়াহুড়ো করার কাজ নয়, কিছু সময় লাগবে। তবে হ্যাঁ, একটা কথা ব'লে রাখি, চাঁদা চাইতে আসিনি।

সত্যই আশ্বস্ত হইলাম। কিন্তু কৌতূহল আরও বৃদ্ধি পাইল।

একটু পরে তিনি প্রশ্ন করিলেন, মেয়ের বিয়ের বিজ্ঞাপন আপনিই দিয়েছিলেন ?

বিস্ময়ে প্রায় বাক্‌রোধের উপক্রম হইয়াছিল, কোন মতে ঘাড় নাড়িয়া জানাইলাম, হ্যাঁ।

মেয়েটি কেমন দেখতে ? নেহাৎই কি অচল ?

প্রশ্ন করিলাম, এসব অবান্তর কথার কি অর্থ জিজ্ঞাসা ক'রতে পারি কি ?

তিনি বিচলিত হইলেন না। তেম্‌নি প্রশান্ত কণ্ঠেই কহিলেন, পাবেন, তবে এখন নয়, আর একটু পরে। বয়স কত মেয়ের ? মানে লোককে কত বলেন ?

অতি কষ্টে ক্রোধ দমন করিয়া কহিলাম, সতেরো।

হ্যাঁ, তার মানে কুড়ি-একুশের কম নয়। ভালই। বুদ্ধি-শুদ্ধি কেমন ? খুব হাঁদা নয় ত ?

আর ধৈর্য্য রাখিতে পারিলাম না। অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই তিনি খপ্‌ করিয়া আমার হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া কহিলেন,

বুঝেছি বুঝেছি, বসুন, আমি সন্ন্যাসী মানুষ আমার উপর রাগ ক'রতে নেই—হিঁদুর ছেলে, এটা মানেন ত ?

এ লোকের উপর রাগ আর কতক্ষণ রাখা যায় ? অগত্যা বসিয়া পড়িলাম, কিন্তু লোকটার ধৃষ্টতায় মনটা অপ্রসন্ন হইয়াই রহিল।

সাধুটী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, বিবাহ আমিই করতে চাই।

খানিকটা নির্ব্বাক্ অবস্থায় তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া শুধু প্রশ্ন করিলাম, তার মানে ?

মানে আর কি, বিয়ে করবার ইচ্ছা হয়েছে,—এই। আমি আপনাদের পাল্‌টি ঘর, পদবী বোস।

লোকটাকে আঘাত করিবার ইচ্ছা বহুক্ষণ হইতেই মনে ছিল, প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের সুরে কহিলাম, কেন, সাধুগিরিতে কি অরুচি ধরে গেল ?

সাধুজী ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, উঁহু, বরং তার বিপরীত। যত দিন যাচ্ছে ততই সাধুগিরিতে প্রবল আসক্তি জন্মাচ্ছে।

হয় এ লোকটি উন্মাদ হইয়া গিয়াছে, নয়ত আমারই মাথার ঠিক নাই। চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম, প্রশ্ন করার চেষ্টা এ ক্ষেত্রে ছাড়িয়া দেওয়া ছাড়া আর উপায় কি ?

তিনি বোধ করি আমার মনের কথাটা বুঝিতে পারিলেন। কহিলেন, ভয় নেই, আমরা কেউই পাগল হইনি। তবে আসল কথাটা আপনাকে খুলে বলি। সাধুগিরি আমার পেশা—নেশা নয়।

জবাব দিলাম, সেটা ত অনেকেরই। তবে আপনার মত সহজে কেউ স্বীকার করে না। আপনি কোন সম্প্রদায়ের ?

তিনি ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, কোন সম্প্রদায়েরই নয়। রামকৃষ্ণ মিশনেব সন্ন্যাসীদের মতই পোশাকটা করেছি, কারণ এইটেই ফ্যাশন। লেখাপড়া জানা লোকেরা জটা-ফটা অত পছন্দ করে না।

আমি হাসিয়া কহিলাম, তাহ'লে নেহাৎই ভণ্ড।

অকস্মাৎ লোকটি যেন একটু তাতিয়া উঠিলেন, কহিলেন, ভণ্ড কিসের? কেউ লোকেব সেবা করে প্রাণে পরোপকারের বাসনা আছে ব'লে, আর নার্সরা করে মাইনে পায় ব'লে। তা ব'লে নার্সদের কি আপনারা ভণ্ড বলেন?

কহিলাম, তাই ব'লে গেরুয়া কাপড়টাকে অপমান করা কি ভাল?

—গেরুয়া কাপড়ের সঙ্গে সম্পর্ক কি? এটা ত আমার ইউনিফর্ম্ম। কর্পোবেশনে যারা কাজ করে তাদের এক বকম পোশাক, রেলে যাবা কাজ করে তাদের আর এক রকম, আবার পুলিশের লোকেব পোশাক অন্য রকম। কৈ, তাতে ত আপনারা আপত্তি করেন না। গেরুয়া কাপড ত অনেকে সখ ক'রেও পরে।

এ সব কথার আর কি জবাব দিব? অগত্যা চুপ কবিয়া গেলাম। তিনি কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, যখন আই-এস-সি পড়ি তখন বাবা মাবা গেলেন, মা আগেই গিয়েছিলেন। ছিলেন এক মামা, আমাকে পডাতে পারেন এ সঙ্গতি তাঁর ছিল না, তবু কোন মতে পাশকরা পর্য্যন্ত খবচাটা তিনিই চালিয়ে ছিলেন। তারপর পূরো তিনটি বছর ধরে কলকাতার প্রায় সমস্ত আফিসে, সমস্ত দোকানে ঘুরে বেড়িয়েছি যে-কোন একটা চাকবীর জন্য, কিন্তু দশ টাকা মাইনের চাকরীও একটা জোটেনি। টিউশানী একটা ছিল, দু বেলা পড়ানো, তিনটে ছেলেমেয়ে, দশ টাকা মাইনে—তবুও করছিলুম, কিন্তু তাও একদিন গেল। তারা বদ্‌লী

হয়ে বিদেশে চলে গেল। তখন মরিয়া হয়ে উঠে এই পেশা ধরলুম। দেশে পৈত্রিক ভিটের সিকিখানা অংশ ছিল, জ্ঞাতি ভাইকে পাঁচশ টাকায় বেচে কল্‌কাতাতে চলে এলুম, আর সেই দিন থেকেই গেরুয়া ধরলুম।

অত্যন্ত বিস্ময়ের সহিত কথাগুলি শুনিতে ছিলাম, প্রশ্ন কবিলাম কিন্তু টাকা ?

তিনি জবাব দিলেন, টাকা নইলে কোন ব্যবসাই চলে না। সাধুগিরিরও মূলধন চাই। এখানে একটা ভাল দেখে ঘর ভাড়া ক'রতে হ'য়েছে, দু একটা সিল্কেব 'বহির্বাস'ও রাখতে হ'য়েছে—তাব ওপব প্রথম দিন কতক ত অনবরত ট্যাক্সী ক'রেই ঘুরতে হ'য়েছে, ট্রাম বাসে চাপতে সাহস করিনি, পাছে লোকে ছোটখাট সন্ন্যাসী ভাবে।

কহিলাম, তারপর ?

তারপর আব কি! প্রথম প্রথম কিছুদিন একটু বেগ দিয়েছিল, টাকা যা উঠত তাতে ট্যাক্সী ভাড়া পোষাত না, মূলধন খেযে যাচ্ছিল। তারপর বেশ জমে গেল। এখন আপনার আশীর্ব্বাদে ছোটখাট একটা ব্যাঙ্ক ব্যালান্সও আছে, দু-একখানা ক্যাশ সার্টিফিকেটও কিনেছি, তা ছাড়া দেওঘবের কাছে অনেকখানি জমিও নিয়েছি আশ্রমের জন্যে। এ সব, যদি মেয়ে দিতে রাজী থাকেন ত, কাগজ-পত্র দেখিয়ে প্রমাণ ক'রে দিতে পারব।

প্রশ্ন করিলাম, কিন্তু সন্ন্যাস নিযেছেন, আশ্রম ক'রছেন—এব ভেতর আবার স্ত্রী আসছে কোথায় তা-ত বুঝতে পারলুম না।

সন্ন্যাসী হাসিলেন। কহিলেন, আশ্রম-টাশ্রম না থাকলে নিয়মিত চাঁদা পাবার অসুবিধে হয়। অথচ বিবাহ করাও প্রয়োজন আমাব।

এক্ষেত্রে স্থির ক'রেছি যে একেবাবে আশ্রম তৈরী কবার পর ঐ-খানেই একদিন সত্যানন্দ মহারাজ ও তাঁর 'মাতাজী' একেবারে গিয়ে হাজির হবেন। মাতাজী ওখানে গার্ল স্কুল ক'রবেন আর আমি ক'বব হাসপাতাল—দেখবেন হুড হুড় ক'রে টাকা আসতে থাকবে।

সবিস্ময়ে কহিলাম, তার মানে—আমার মেয়েকে গেরুয়া পরাবেন ?

'মহারাজ' কহিলেন তা পরাতে হবে বৈকি! কিন্তু তার জন্যে ভাববেন না, অল্প বয়সী মেয়েদের গেরুয়া পরলে ভালই দেখায়। ট্রেনে গেলে দেখবেন ট্রেন সুদ্ধ লোক ভীড ক'ববে সেই কামবারই সামনে। আশ্রমও খুব সম্ভব চটুপটু জমে যাবে, তরুণী মাতাজী থাকলে।

আমাব কান দুইটা গরম হইযা উঠিল, উষ্ণ কণ্ঠেই জবাব দিলাম, না মশাই, ওসব আমাব দ্বারা চলবে না। আপনি অন্যত্র পাত্রী দেখুন।

এইবার সাধুজীর বিস্মিত হইবাব পালা। তিনি কহিলেন, সে কি !···আমাব মত পাত্র পাওয়া কি সোজা কথা ? কোন্ কেরাণী জামাই আমার মত রোজগাব ক'বত শুনি! বিশ্বাস না হয়, ব্যাঙ্কে চলুন, আমি পাশ বই দেখিয়ে দিচ্ছি।

আরও উচ্চকণ্ঠে কহিলাম, টাকা অনেকেবই থাকে, আমাকে ও দেখিয়ে লাভ নেই। কিন্তু তাই ব'লে আমার মেয়েকে দিয়ে রোজগার কবাবেন, এ কথা জেনেও আমি আপনাকে মেয়ে দিতে পারি না। কোন ভদ্রসন্তানই পারে না।

যেন ঈষৎ একটু বিদ্রূপের সুরে তিনি বলিলেন, মেয়ে মাস্টারী ক'রবে, তাও বরদাস্ত ক'রতে পারবেন না ?

জবাব দিলাম, কিন্তু এ মাস্টারী করার পেছনে যে আপনার একটা মস্ত বড় অভদ্র ইঙ্গিত রয়েছে—

তিনি হাসিলেন। কহিলেন, দেখুন সত্যি কথা বলার বিপদ এই! মশাই, আমাদের দেশে মেয়ে-ছেলে আছে অথচ অভদ্র ইঙ্গিত নেই, এমন কোথাও দেখেছেন? যে সব মেয়েরা মাস্টারী করে, তাদের মধ্যে যাদেব স্থন্দর চেহারা তাদের হু-হু ক'রে মাইনে বাড়ে—তা জানেন কি? কিন্তু তার পেছনে অভদ্র ইঙ্গিত খুঁজে কোন 'ভদ্রসন্তান' মা-বাপই মেয়েকে মাস্টারী ছাড়ায় না, কিম্বা কোন মেয়েও ছাড়ে না—বরং নিজের কৃতিত্বে পুলকিত হয়ে ওঠে! আমি কথাটা স্পষ্ট ক'রে ব'লে ফেলেছি এই কি আমাব অপবাধ!

ততক্ষণে মাথাও কিছু ঠাণ্ডা হইয়াছে। এ লোকটাই কটুভাষী, সব জিনিষেবই কদর্থ করা ইহার স্বভাবে দাঁড়াইয়াছে, ইহার সহিত বিবাদ করা বৃথা। কহিলাম, কিন্তু এ কথাব ত চট্ ক'রে জবাব দেওয়া যায় না। আমার স্ত্রীর মত নিতে হবে মেয়েকেও জিজ্ঞাসা ক'রতে হবে।

সাধুজী একটুখানি মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিলেন, তার জন্য বেশী বেগ পেতে হবে না, তাঁরা ঐ দোরের আড়ালেই আছেন, বোধ করি সবই শুনেছেন।

দোরের আড়ালে অকস্মাৎ দুড়-দুড় শব্দ। বুঝিলাম সাধুজীর অনুমানই ঠিক, এখন লজ্জা পাইয়া পলাইতেছেন। স্থতরাং মহারাজকে বসাইয়া অন্তঃপুরে যাত্রা করিলাম। কিন্তু সেখানে গিয়া দেখি গৃহিণী অগ্নিমূর্ত্তি।

কহিলেন, বিদেয় করো, বিদেয় করো ও আপদকে এক্ষুনি! ভণ্ড

নাস্তিক, আবার গেরুয়া পরেছেন।···আর কি অসভ্য, তুমি বসে বসে ওর কথাগুলো শুনছিলে কী ক'রে ?

ইহার জবাব দেওয়া হয়ত আমার সাহসে কুলাইত না, মিনি কিন্তু বলিয়া ফেলিল, শুনছিলে ত তুমিও মা, এতক্ষণ ধবে—

গৃহিণী ধমক দিয়া উঠিলেন, তুই থাম মিনি, সব তাইতে কথা কইতে আসিস্‌নি। কিন্তু ওসব গেরুয়া-ফেরুয়া আমার এখানে চলবে না—

ঢোক গিলিয়া কহিলাম, কিন্তু লোকটা কথাগুলো খুব অন্যায় ব'লছিল না। তা ছাড়া লেখাপড়া জানা অথচ বোজগার করে এমন পাত্র আব কোথায় পাচ্ছ তুমি ?

তা ব'লে ঐ জোচ্চোবটাকে মেয়ে দিতে হবে নাকি ? গৃহিণী ধমক্ দিয়া উঠিলেন, তা ছাড়া সন্ন্যাসীর হাতে মেয়ে দেবে কি ক'রে ? কুটুম্ব-সাক্ষাৎকেই বা বলব কি ? এধারে সন্ন্যাসী, তাব সঙ্গে আবাব সাতপাক ঘুরিয়ে বিয়ে ?

জবাব দিলাম, কুটুম্ব-সাক্ষেৎ না হয় কাউকে নাই বললে। বিয়ের দিন ওকে সাদা কাপড় পরে চুপি চুপি আসতে ব'ললেই হবে—। পবে ব'ললেই হবে যে মেয়ে-জামাই দু' জনেই সন্ন্যাস নিয়েছে ! বেশ সোরগোল পড়ে যাবে তখন !

কল্পনায় নিজে তাতিয়া উঠিতেছিলাম। কিন্তু গৃহিণী তখনও কঠিনা। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ভাবে একবার চতুর্থীর দিকে চাহিলাম। মেয়েটা বুদ্ধিতে বৃহস্পতি, আমার তাই ধারণা। আর বাস্তবিক মিনিই সে যাত্রা আমাকে রক্ষা করিল, কহিল, বাবা সেজ্‌দিও ত সব শুনেছে আড়াল থেকে, ওর মতটা একবার নাও না—

আমি যেন আঁধারে কূল পাইলাম। টুটুর হাতটা ধরিয়া ঘরের মধ্যে লইয়া গিয়া কহিলাম, আমাকে ঠিক্ ঠিক্ জবাব দিবি মা। তা হ'লে ওকে তাড়িয়েই দিই ?

টুটুর গাল দুইটা লাল হইয়া উঠিল। মাথা নীচু করিয়া নীরবে নখ খুঁটিবার পর কহিল, তুমি যদি ভাল বোঝ বাবা তা হ'লে আমার আর আপত্তির কি থাকতে পারে ?

তবে কি সাধুজী আমার কন্যার উপর ইতিমধ্যেই প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন ? সন্দিগ্ধ কণ্ঠে কহিলাম, শুধু আমাকে নিশ্চিন্ত করার জন্যে একথা বলছিস না ত ? বাইশ বছর মেয়েকে পুষলুম, আর দুটো-তিনটে বছর অনায়াসে পুষতে পারব। ভাল ক'রে ভেবে দেখ—

কন্যা জবাব দিলেন, তা কেন বাবা। আমি ত আর তোমাদের আপদ-বালাই হয়ে নেই !

নিশ্চিন্ত হইয়া নীচে নামিয়া গেলাম। দেখি সাধুজী তাকিয়ায় ঠেস্ দিয়া চুপ করিয়া শুইয়া আছেন, চক্ষু নিমীলিত। আমার পদশব্দে চোখ খুলিয়া কহিলেন, বুঝেছি অন্তঃপুরে গোলযোগ। তা দেখুন, বিয়ের কথাটা আজ থাক—আজ আর আপনার কাছ থেকে শেষ জবাব নেব না। কিন্তু আপনাকে একটি কাজ করতে হ'বে। আপনাদের এই পাড়ায় যে দরিদ্র ভাণ্ডার আছে, আসছে রবিবার তার বার্ষিক উৎসব। আমাকে ধরেছে বক্তৃতা করার জন্যে, মানে আমিই তাদের ধরিয়েছি—যাক্, ঐদিন একবার গৃহিণীকে নিয়ে যেতে পারেন ? দোষ কি ?···তারপর আমি শেষ জবাব শুনে যাব একদিন—

লোকটি কি অনবরতই নব-নব বিস্ময় নিক্ষেপ করি:বে। বিস্ময়-

বিমূঢ় নেত্রে কিছুক্ষণ তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিলাম কী বলছেন আপনি ? আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি না।

তিনি কহিলেন, বাংলা কথাগুলির শব্দগত অর্থ বুঝেছেন কি ?

তা ত বুঝেছি।

তাতেই হবে।...এই বলিয়া তিনি নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

তখনও আমি বিস্ময়ের ধাক্কা সামলাইতে পারি নাই। দারুণ সন্দেহও একটা দেখা দিয়েছে। লোকটা পাগল নয় ত ? একটা উন্মাদের সহিত কি এতক্ষণ বকিলাম ? ·কিন্তু ঠিক তাও-ত মনে হয় না—

গৃহিণী বাহির হইতে উঁকি মারিয়া ভিতরে আসিয়া কহিলেন, সে মড়া চলে গেল নাকি—?

আসলে কথাটা চাপিয়া গিয়া কহিলাম, তুমি যা-তা ব'ললে তাকে। চোর জোচ্চোর আরও কত কি—তার পরেও সে কি থাকতে পারে ?

গৃহিণী সংক্ষেপে কহিলেন, ব'লব না ত কি ?...গেছে আপদ গেছে। তাহার পর কতকটা আপন মনেই কহিলেন, ছোঁড়ার চেহারাটা কিন্তু মন্দ নয়। লেখাপড়া শিখেছে, একটা চাকুরী বাকুরী কর বাপু, তা নয়—জুচ্চুরী ক'রে খাবার মতলব !

সন্দেহ যাহাই হউক, রবিবার দিন গৃহিণী আর টুটুকে লইয়া দরিদ্র-ভাণ্ডারের বার্ষিক অধিবেশনে যোগদান করিলাম। গৃহিণী কিছুই জানিতেন না, সভাগৃহে ঢুকিয়া সভাপতির পাশে সত্যানন্দকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া ফিস্-ফিস্ করিয়া কহিলেন, ও মা, সে মড়া আবার এখানে কি ক'রছে !

কোন জবাব দিলাম না। মেয়েদের বসিবার নির্দ্দিষ্ট আসনের দিকে তাঁহাদের ঠেলিয়া দিয়া নিজে যতটা সম্ভব সামনের দিকে গিয়া বসিলাম। সাধুজী সবই দেখিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রশান্ত ও সমাহিত মুখের চেহারায় কোন পরিবর্ত্তনই হইল না। যেমন ভাবে বসিয়া ছিলেন, তেম্‌নি ভাবেই বসিয়া রহিলেন।

কিছুক্ষণ পরে সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। কোন্ এক অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। সম্পাদকের বার্ষিক বিবরণী পাঠ শেষ হইবার পরই তিনি সত্যানন্দ মহারাজকে অনুরোধ করিলেন, 'কিছু বলিবার' জন্য। পরিচয় করাইয়া দিলেন, ইনি ভারতবর্ষের বহু স্থান ঘুরে বেড়িয়েছেন এবং বহু মুমূর্ষু দাতব্য প্রতিষ্ঠানকে ইনি আবার গড়ে তুলেছেন। দরিদ্রনারায়ণের সেবাই এঁর জীবনের ব্রত।

তাহার পর 'মহারাজ' স্বয়ং উঠিলেন। অতি শান্ত কণ্ঠস্বর, বিনয় এবং জ্ঞানের অদ্ভুত একটা সমন্বয় সে কণ্ঠে, শুনিলেই চোখ নত হইয়া আসে। লোকটাকে চাক্ষুষ দেখিয়াও বিশ্বাস হইতেছিল না যে এই লোকটিই মাত্র দিন-সাতেক আগে আমার বৈঠকখানায় আমার কন্যার পাণি-প্রার্থনা করিতে আসিয়াছিল!

সাধুজী বলিতে শুরু করিলেন, আমি আজ গেরুয়া পরে সন্ন্যাসীর পরিচয়ে আপনাদের সামনে দাঁড়িয়েছি বটে, কিন্তু সে মিছে কথা। আমি সন্ন্যাসী নই, মুক্তি আমার সাধনার লক্ষ্য নয়। কিন্তু তবু আমি গেরুয়া পরেছি, কেন জানেন? আপনারা আর কোন পোশাককে বিশ্বাস করেন না ব'লে। অন্য যে কোন বেশে গিয়ে আপনাদের দোরে দাঁড়ালে খালি হাতে ফিরতে হ'ত। অথচ আমার জীবনের

লক্ষ্যে পৌছতে হ'লে আপনাদের সাহায্য চাই-ই, তাই আমার এ ভণ্ডামী, তাই আমার এ ছদ্মবেশ!



আমি আজ গেরুয়া পরে সন্ন্যাসীর পরিচয়ে আপনাদের সামনে দাঁড়িয়েছি বটে, কিন্তু···

এই বলিয়া তিনি কিছুক্ষণ নাটকীয় ভাবে চুপ করিয়া দাঁড়াইলেন। তাহার পর আবার তিনি শুরু করিলেন। দরিদ্রনারায়ণের সেবাই যে ভগবানের পূজা, এই চিরপুরাতন কথাটা অতি কৌশলে নূতন

করিয়া বুঝাইতে বুঝাইতে কেমন করিয়া এবং কখন যে তিনি আধ্যাত্মিকতায় চলিয়া গেলেন তাহা ধরিতে পারিলাম না। কিন্তু ইহার পর যেভাবে অনর্গল বিভিন্ন শাস্ত্রবাক্য জলপ্রপাতের মত তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইয়া আসিতে লাগিল তাহা সত্যই বিস্ময়কর। গৃহিণীর দিকে আড়ে চাহিয়া দেখি তাঁহার চোখ দিয়া জল পড়িতে শুরু করিয়াছে, আর টুটু স্থান-কাল-পাত্র ভুলিয়া বিস্ফারিত নেত্রে একদৃষ্টে স্বামীজীর দিকে চাহিয়া আছে। এইভাবে আধঘণ্টাকাল অনবরত গীতা, ভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত, পালিধর্ম্মগ্রন্থ, কোরাণ এবং বাইবেল হইতে বিভিন্ন বাণী উদ্ধার করিবার পর যখন তিনি থামিলেন তখন আর কাহারও বিশেষ কিছু বলিবার উৎসাহ রহিল না। দু'একজন ব্যর্থ চেষ্টা কবিবাব পর মিনিট-কতকের মধ্যেই সভার কার্য্য শেষ হইয়া গেল।

গৃহিণী বাহিবে আসিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে কহিলেন, আহা সাক্ষাৎ দেবতা।...ছিঃ ছিঃ, কী কটু-কথাই না ব'লেছি এঁকে। মানুষ নন ব'লেই অম্লানবদনে সহ্য ক'রছেন।...ওগো, ইনি নিশ্চয় সেদিন ছলনা ক'রতে এসেছিলেন তোমায়।

কহিলাম, এখনও যদি উনি রাজী থাকেন তা'হলে কি মেয়ে দেবে ওঁকে!

এক্ষুণি, এক্ষুণি! দয়া ক'বে যদি পায়ে ঠাঁই দেন ত আর দু-মত ক'রো না!

জবাব দিলাম, কিন্তু কুটুম্ব স্বজনকে কি ব'লবে?

তিনি তাহার উত্তরে যে কটূক্তি করিলেন, কুটুম্বদের ভয়ে তাহার আর উল্লেখ করিব না।

পরের দিন ভোরবেলাই সাধুজী উপস্থিত। কহিলেন, কেমন, সব ঠিক হয়ে গেছে ত ?

বিস্মিত হইয়া কহিলাম, তা হ'য়েছে কিন্তু সেই জন্যই কি আপনি—

তিনি বলিলেন, নিশ্চয় ! ঐ ত আমাব কোয়ালিফিকেশনের পবীক্ষা !

মনটার মধ্যে যেন কেমন গোলমাল বোধ হইতে লাগিল। বলিলাম, কিন্তু এখনও যেন আমার বিশ্বাস হ'চ্ছে না !

তিনি হাসিয়া জবাব দিলেন, ঐখানেই ত আমার কৃতিত্ব।

তাহার পর কহিলেন, আর্জ্জি তাহ'লে আমার মঞ্জুর ত !

প্রাণপণে দ্বিধা দমন কবিয়া কহিলাম, হ্যাঁ, আমাব কোন আপত্তি নেই। যা থাকে কপালে, একটা তবু নতুন কিছু হবে। আপনি যদি রাজী থাকেন এখনও, আমিও আছি।

সাধুজী বলিলেন, আপনার মেয়েটিকে সেদিন দেখলুম। মন্দ নয় ব'লেই বোধ হ'ল। সুতরাং আমার আর আপত্তির কি থাকতে পারে ?

অতঃপর পাকা কথা শুরু হইল। আগামী ৮ই তারিখে বিবাহের দিন ধার্য্য হইল, কথা হইল আমরা দেশে চলিয়া যাইব এবং সেখানেই উনি সাদা পোশাকে দুই-তিনটি বন্ধুবান্ধব লইয়া গিয়া বিবাহ কার্য্যটা সারিয়া ফেলিবেন। তাহাব পর মাস দুই-তিন বিহারের কোন শহরে গিয়া হনিমুন সারিয়া আবার সাধুবেশে দেওঘরে আসিবেন এবং আশ্রমেব পত্তন করিবেন।

সাধুজী বিদায় লইলে ধীরে ধীরে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলাম। মনটা কেমন ভারী হইয়া রহিল, বিসদৃশ কোন কাজ করিতে গেলে যেমন ভার ঠেকে, তেম্‌নিই !·· কে জানে কী হইবে !

গৃহিণী আসিয়া কহিলেন, আহা এমন ভাগ্য কি হবে? টুটুর আমার জন্ম সার্থক, দেবতার পায়ে ঠাঁই পেলে।

মিনি বড়ই ঠোঁট্ কাটা, সে কহিল, অতই যদি সাধু ত আবার বিয়ে ক'রছেন কেন?

গৃহিণী জিভ্ কাটিয়া কহিলেন, ব'লতে নেই। ও ওঁদের লীলা।

মিনি মুচ্‌কি হাসিয়া আমার দিকে ফিরিয়া কহিল, তুমি কিচ্ছু ভেব না বাবা, সেজদিকে আমি সব শিখিয়ে পড়িয়ে দিয়েছি—ঐ তিন মাসেই সাধুজীর গেরুয়া ঘুচিয়ে দিদি মানুষ ক'রে নেবে'খন। দেওঘরের জমিতে ব'লে দিয়েছি মুরগীর চাষ আর গোলাপ বাগান ক'রতে, আমরাও মাঝে মাঝে গিয়ে থাকব।

গ্র্যাণ্ড হোটেল

উত্তর বঙ্গের বড় শহর। শহর অর্থাৎ সেখানে আদালত আছে, মোকদ্দমা করিতে গাড়ীভাড়া করিয়া জেলার সকল স্থান হইতেই লোক আসে; আমাদের বাংলা দেশে শহরের আর কোনও বর্ণনার প্রয়োজন হয় না।

বই-এর ব্যবসা করি, বই লইয়া হেড্‌মাস্টারদের দ্বারে দ্বারে ফিরি করিয়া বেড়াইতে হয়; সুতরাং গ্রাম বা নগর বিবেচনা করিবার অধিকার আমাদের নাই; যেখানে একাধিক ইস্কুল আছে, সে নিশ্চয়ই শহব এবং সেখানে যাইতেই হইবে। তবু ত এতদিন এখানে যে আসিতে পারি নাই সেটা নিতান্তই আমার অদৃষ্ট!

স্টেশনে নামিয়া কুলীকে প্রশ্ন করিলাম, বাপু হোটেল আছে?

সে জবাব দিল, আছে বৈ কি! এই ধারেই হোটেল আছে, ভাল।

কহিলাম, তবে চল বাপু একটু পা হাঁকিয়ে, একটু বিশ্রাম না ক'বে আব স্নানাহার করা যাবে না—অথচ কাজও বিস্তর।

স্টেশনের সীমানা ছাড়াইয়াই একটি অপেক্ষাকৃত চওড়া রাস্তা, তাহারই দুইধারে কয়েকটি মনোহারী ও দর্জ্জির দোকান, খাবারেব দোকান, চায়ের রেস্তোঁরা, মুসলমানী হোটেল ও অদ্বিতীয় একটি হিন্দু হোটেল একবারে ঠাসাঠাসি করিয়া অতিকষ্টে যেন দাঁড়াইয়া আছে। সব-ক'টি ঘরেই ছিটে-বাঁশের বেড়া এবং মাথায় কাহারও টিন, কাহারও বা তাহাও জোটে নাই—হোগলায় আত্মরক্ষা করিতেছে। ইহাতেও আপত্তি ছিল না, কিন্তু কুলী যখন হোটেলে আনিয়া আমার ব্যাগটা ও

বিছানাটা দ্বারের বাহিরেই নামাইয়া দিয়া কহিল, 'দিন বাবু, আমার পয়সাটা' তখন ভিতরের দিকে চাহিয়া আমার বুকের রক্ত জল হইয়া যাইবার উপক্রম হইল। কাল সারারাত্রি ঘুম হয় নাই, দিনে পরিশ্রম করিতে হইয়াছে, আজও হইবে, সুতরাং এখন অন্তত একটুখানি বিশ্রাম না করিতে পারিলে চলে কি করিয়া? কিন্তু বিশ্রাম করিব কোথায়?

সামনেই বিস্তৃত একটা হলঘরের মত, তাহারই মধ্যে চলাচলের সামান্য একটু স্থান বাদ দিয়া দুইপাশে ঢালা মাচা করা ও মাচার উপর মাদুর বিছানো; তাহার উপর পাশাপাশি গাদাগাদি অসংখ্য বিছানা ও বাক্স পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার মধ্যে বসিবার মত তিলমাত্র স্থানও অবশিষ্ট নাই।

ঘরের মধ্যে লোকও বিস্তর কিন্তু তাহার অধিকাংশই একটি খর্ব্বাকৃতি শীর্ণকায় লোককে ঘিরিয়া হল্লা করিতেছিল, দুই একটি যা এধার ওধারে ছিল তাহাদেরই একজনকে ডাকিয়া প্রশ্ন করিলাম, মশায় হোটেলের মালিক কে বলতে পাবেন?

সে লোকটি মনোযোগের সহিত একখানা চিঠি লিখিতেছিলেন, মাথা না তুলিয়াই জবাব দিলেন, উনিশখানা চিঠির জবাব দিতে হবে, তা-ছাড়া চিঠি লিখতে আমার একটু সময় যায়; এমন ক'রে বিরক্ত করলে লিখি কি ক'রে?…একে ত ঐ হল্লা!…হুঁ!

লোকটির অভদ্র জবাবে অত্যন্ত উষ্ণ হইয়া উঠিতেছিলাম কিন্তু তিনি অকস্মাৎ কলম থামাইয়া কহিলেন, মলিক নেই, বাজারে গেছে—আমি ঠাকুরকে ডেকে দিচ্ছি। এই যে যত চিঠি দেখছেন সব এখানেই পরিচয়। আসেন যত ক্যানভার, একদিন দুদিনেই চ'লে যান কিন্তু আমাকে আর

ভুলতে পারেন না। ঐ চিঠি আসতে থাকে, কেউ ভাই, কেউ দাদা, কেউ বা শুধু হরেন বাবু, হরেন দা, দেখুন না হরেক রকম চিঠি!··· সব কটিরই জবাব দিতে হবে, নইলেই অভিমান। পয়সা কি কম খরচ হয়? মাইনে ত পঁয়ত্রিশ, সে আজ এগারবছরেও চল্লিশ হ'লনা; উপ্‌রি ছিল, তাও ক'মে আস্‌ছে—মামলাই করেনা ব্যাটারা। ···আমি পারমেনেণ্ট বোর্ডার কি না!···আমার নেটের মশারী দেখছেন না?

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলি বলিয়া ভদ্রলোক উঠিয়া ভিতরে গেলেন, আমিও হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। তাঁহার বিছানার দিকে চাহিয়া দেখিলাম যে সত্যই তাঁহার মশারীটা নেটের এবং বিছানাও—সেই অসংখ্য বিছানার মধ্যে তাঁহারটিই কিছু ভদ্র।

একটু পরেই এক হিন্দুস্থানী পাচক খৈনি ডলিতে ডলিতে দেখা দিল, তাহাকে প্রশ্ন করিলাম, বাপু থাকবার জায়গা কৈ?

সে একবার অসহায়ভাবে চারিদিকে চাহিয়া কহিল, জায়গা ত আছে না বাবু!

সর্ব্বনাশ! এখন উপায়?

কহিলাম, আর কোথাও হোটেল আছে?

হরেনবাবু ততক্ষণে আসিয়া পড়িয়াছিলেন, কহিলেন, এখানে আবার হোটেল! লোক কোথায় যে হোটেল থাকবে? একটা ঐ আছে কাছারীর কাছে, কিন্তু তার মোটে একটাই ঘর, সেখানে লোক খাওয়াবে না আপনাকে থাকতে দেবে?

প্রায় কাঁদ-কাঁদ হইয়া কহিলাম, তা'হলে আমি যাই কোথায় বলুন, ঠায় কি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরব এই মালপত্র সব নিয়ে?

যে শীর্ণ লোকটিকে ঘিরিয়া হল্লা চলিতেছিল, সে অকস্মাৎ সেই জনতার

মধ্য হইতে ছিট্‌কাইয়া বাহির হইয়া আসিয়া কহিল, বাবু কি জায়গা পাচ্ছেন না ?…তাইতেই অত ভাবনা।…আরে মশায় একজনের বিছানাটা একটু গুটিয়ে দিয়ে বাক্স-বিছানাগুলো তুলে দেন্ না! তারপর স্নানাহার করেন, কাযকর্ম্ম সারেন, শোবেন ত সেই রাত্রে ?…রাত্রের গাড়ীতে যাবেই কেউ-না-কেউ, তখন শোবেন সেইখানে। একটু হুঁসিয়ার থাকবেন—লোক গেলেই অমনি দখল—।

তারপর সে যেমন আসিয়াছিল তেমনই আবার দম্‌কা সেই জনতার মধ্যে চলিয়া গিয়া চেঁচাইতে শুরু করিল। আমারও তখন আর অপেক্ষা করাব মত অবস্থা নয়, কোথাও একটু বসা চাই-ই,—আমি তাহারই উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইয়া এক ভদ্রলোকের বিছানাটা একটু গুটাইয়া দিয়া বাক্সটি তুলিয়া রাখিলাম, তারপর তাহারই উপর বিছানাটি রাখিয়া ঠেস্ দিয়া বসিলাম।

হয়ত ক্লান্তিতে চোখও বুজিতাম, কিন্তু ঘরের মধ্যে তখন অস্টার্-লীজের যুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছে। অল্প একটু শুনিয়া যাহা বুঝিলাম, ঘরসুদ্ধ লোক ঐ শীর্ণকায় লোকটিকে ক্ষেপাইতেছে এবং সে লোকটির যন্ত্র ছোট হইলেও তাহা হইতে কলরব যথেষ্ট বাহির হইতেছে, অর্থাৎ একাই সে একশত লোকের চীৎকার করিতেছে। লোকটির দিকে এতক্ষণে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলাম, যেমনি রোগা তেমন ময়লা, চুলগুলার সংস্কার নেই, মুখ খোঁচা-খোঁচা দাড়ী গোঁফে আচ্ছন্ন, গায়ের চামড়ায় খড়ি উড়িতেছে, চোখের কোণে গত রাত্রির নিদ্রার চিহ্ন এবং অবিরত বিকট চীৎকারে ওষ্ঠের দুই পাশ বহিয়া থুথু গড়াইতেছে। পরনে অতিশয় ময়লা একখানা কাপড়ের উপর অপেক্ষাকৃত ফরসা একটা শার্ট।

যাহারা রহস্য করিতেছে, তাহাদের দেখিয়াও বিশেষ ভরসা

পাইলাম না। কথাবার্ত্তায় ও ধাঁজধরণে বুঝিলাম যে তাহারা প্রায় সকলেই ক্যানভাসার। কিন্তু অভিজাত শ্রেণীর নয়। কলিকাতায় যাহারা কাগজে বিজ্ঞাপন করে এবং পোষ্টার দেয়, তাহাদের ক্যানভাসাররা অভিজাত শ্রেণীর ; ইহারা কিন্তু সে-সব জিনিষ লইয়া আসে নাই। ছোটখাট গলির মধ্যে যে সব শিশু প্রতিষ্ঠান জন্মায় তাহাদেরি মালপত্র স্যুটকেশ বোঝাই করিয়া অতি সামান্য রাহা-খরচ সম্বল করিয়া ইহারা আসিয়াছে। ষাট বৎসরের বৃদ্ধ হইতে বাবো-তেরো বৎসরের বালক পর্য্যন্ত ইহার মধ্যে আছে ; যেমন মলিন তাহাদের পরিধেয়, তেমনিই মলিন তাহাদের রসিকতা। সকলেই একসঙ্গে বিড়ি টানিতেছে এবং ইয়ার্কী করিতেছে, তাহাতে কাহারও কোনও সঙ্কোচ নাই।

চুপ করিয়া বসিয়া ইহাদেরই কাণ্ড-কারখানা দেখিতেছি এমন সময় সেই শীর্ণ লোকটি আবার ছিটকাইয়া আমার কাছে চলিয়া আসিল, দেখছেন মশায়, দেখছেন ; বলি শুনছেন ত সব ? ব্যাটাদের পেটেব মধ্যে ক-অক্ষর গোমাংস তা আর কতদূর কি হবে ? দেখেন দেখি আমার ঐ সাইন বোর্ডটার দিকে, ওতে কি লেখা আছে, কন্ দেখি—

চাহিয়া দেখিলাম একটি টিনের উপর সস্তাদামের হলদে-বঙে লেখা রহিয়াছে—

সর্ব্বপ্রকার বাতবেদনার মহৌষধ

শ্রীশ্রীমহাশঙ্কর তৈল

চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ফল পাইবেন।

সেই টিনটি সযত্নে বাঁশের খুঁটিতে কে টাঙ্গাইয়া রাখিয়াছে।

সে পুনশ্চ কহিল, শেষে পরিষ্কার লেখা রয়েছে ফল পাইবেন,

ব্যাটারা পড়ে কিনা ফল পাইবেন না; আরে মুখ্যুরা ওটা দাঁড়ি, দাঁড়ি—

বাকী লোকগুলি ততক্ষণে হৈ-হৈ করিয়া আসিয়া পড়িয়াছে তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নাবালক যেটি,—অতিশয় ময়লা তেলচিটে কাপড় পরনে এবং মুখে সর্ব্বদা একটা বিঁড়ি—সে কহিল, আচ্ছা দেখুন দেখি কি লেখা—রয়েছে, 'ফল পাইবে না', লেখা নেই—?

মহাশঙ্কর তৈলের লোকটি বারুদের মত জ্বলিয়া উঠিয়া কহিল, হ্যাঁ, 'লেখা নেই'?…মুখ্যু, নিজে পানের মসলা ফিরি করিস্, তোর আর কত বিদ্যে হবে—

আমি ইহাদের ইতর-রসিকতার মধ্যে পড়িবার আশঙ্কায় বাধা দিলাম, তা-ছাড়া লোকটির অবস্থা দেখিয়া ভয়ও হইতেছিল, চেঁচাইতে চেঁচাইতে হার্টফেলই করিবে হয়ত, কহিলাম, আপনি বুঝি ঐ তেলের ক্যানভাসার?

অকস্মাৎ তাহার কণ্ঠস্বর মোলায়েম হইয়া গেল, কহিল, এমন ওষুধ আর হবে না। কাল কাছারীতে আট শিশি তেল বেচেছি, বিশ্বাস না হয় আপনাকে পয়সা গুনে দেখিয়ে দিতে পারি—

ছেলেটা কহিল আরো বিক্রী হ'ত শুধু ঐ সাইনবোর্ডটার জন্যে হোল না; পাঞ্জাবী ক্যানভাসারটা তার হিলিং অয়েল ষোল শিশি বেচে গেল।

কুৎসিত একটা অঙ্গ ভঙ্গী করিয়া লোকটা চেঁচাইয়া উঠিল, হ্যাঁ, বেচে গেল, দেখেছিস্ তোরা?…না বাবু মশায়, ওদের কথা শুনবেন না, আমি এই আপনার গায়ে হাত দিয়ে দিব্বি গেলে বলছি সে ব্যাটা আমার চেয়ে বেশী বেচেনি—



মুখ্যু, নিজে পানের মসলা ফিরি করিস্, তোর আর কত বিদ্যে হবে—

ইতিমধ্যে এক ভদ্রলোক পিছনের দ্বার দিয়া আহার সারিয়া হুঁকা হাতে প্রবেশ করিলেন, ইনিও খর্ব্বাকৃতি, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ কিন্তু বিপুল একজোড়া গোঁফে নিজের মর্য্যাদা ও গাম্ভীর্য্য বজায় রাখিয়াছেন, তিনি

প্রচণ্ড এক ধমক দিলেন, আবার তোমরা ওকে রাগাচ্ছ, যাও সরে যাও, সব !···মামা, তোমাকে না মানা ক'রে দিয়েছি ওদের কথার জবাব দিতে ?

দেখিলাম লোকটিকে সকলে ভয় করে। যাহারা ঘিরিয়া আসিয়াছিল, তাহারা সকলেই কিছুদূরে সরিয়া গেল। নবাগত ভদ্রলোক আমারই পাশে ঝাঁকিয়া আসিয়া বসিলেন, তাহার পর কহিলেন, বাবুর কি কলকাতা থেকে আসা হচ্ছে ?···প্রাতঃপ্রণাম। আমিও কল্‌কাতারই লোক, বিড়ির পাতা ও মসলার এজেণ্ট হীরাদাস নারায়ণজীর ফার্ম্ম আমাদের, মস্ত ঘর ; বিড়ির ব্যবসা বটে কিন্তু তামাক না হ'লে আমার চলে না—এই হুঁকোটি চাই ! তা আপনার কি করা হয় ?

বিনীত ভাবে নিবেদন করিলাম যে বই-এর ব্যবসা কবি। তিনি বড় রকমের খানিকটা ধোঁয়া ছাড়িয়া কহিলেন, দোকান আছে ?··· খাসা ব্যবসা, বই-এর ব্যবসায় শুনেছি বিস্তর লাভ !···যাক্ আপনি দুপুর বেলায় হোটেলেই থাকবেন ত ?

কহিলাম আজ্ঞে না, এখনই স্নানাহার সেরে বেরোব। ইস্কুলে ইস্কুলে ঘুরতে হয় কিনা !

তিনি কহিলেন, তাইত ! দুপুরবেলা আমার আবার একটু তাস না হ'লে চলে না। তা খেলবার লোকই পাইনা, কি ক'রে খেলি বলুন ? দুপুরবেলা কেউ থাকে না, আমি, ম্যানেজার আর ঠাকুর ; আর একটি লোক পেলেই হয়—

তারপর অকস্মাৎ 'মহাশঙ্কর তৈলের' দিকে নজর পড়িতেই কহিলেন, মামুর সঙ্গে পরিচয় হ'ল বুঝি ! আমাদের মামু গায় খাসা—শোনাও দেখি মামু একখানা গান !

'মামু' খানিকটা ইতস্তত করিয়া অকস্মাৎ মেঝের উপব উবু হইযা বসিয়া এক কানে হাত দিযা আব এক হাত বিস্তাব-পূর্ব্বক বিকট চীৎকাব জুড়িয়া দিল—

'মবিব মবিব সখি, নিশ্চয় মবিব গো—'

বেসুর গান অনেক শুনিযাছি, বেতালা ত হবদম, কিন্তু গাধাব ডাকেব চেযেও বেসুর এমন গান আব শুনি নাই, ভয পাইয়া উঠিযা বসিলাম এবং অবিলম্বে জামা দুইটি খুলিযা মাথায় তেল দিযা স্নানেব জন্য বাহির হইযা পডিলাম। হোটেল হইতে প্রায একপোযা বাস্তা তফাতে একটা কুয়া আছে, সেখানেই স্নান সাবিতে হয, তবে হোটেলওযালাবা দয়া করিয়া দডী ও বাল্‌তি দেন।

স্নান সাবিযা ফিরিবাব পথে 'মামু'ব সহিত সাক্ষাৎ, মাথায থানিকটা ও পিঠে খানিকটা তেল দিযা স্নান সাবিতে চলিয়াছেন, তেলগুলি ত্রিধারা হইয়া গডাইতেছে। যাক—হোটেলটি এইবাব বোধ হয শান্ত হইবে, বাঁচা গেল।

কিন্তু হোটেলে পা দিয়াই বুঝিলাম যে শান্তি আমাব অদৃষ্টে নাই, আবার খণ্ডপ্রলয় বাধিয়াছে। 'পারুলবাণী' স্নোব ক্যানভাসাবেব সহিত 'দেশলক্ষ্মী' স্নোর ক্যানভাসারেব হাতাহাতি বাধিয়াছে, পারুলবাণী দাবী করে যে তাহার স্নো বছরে দেডলক্ষ টাকার বিক্রয় হয়, দেশলক্ষ্মী তাহাকে উপহাস কবিয়া বলিযাছে যে অত বিক্রী হইতেই পাবে না, কারণ দেশলক্ষ্মীর মহাজন ক্রোডপতি আব পারুলরাণী যে বাহিব করিয়াছে সে সামান্য গৃহস্থ। এত উত্তম যুক্তিও 'পারুলবাণী' মানিয়া লইতে রাজী হইলনা, ফলে হাতাহাতি।

কোনও রকমে পাশ কাটাইয়া ভিতরের রান্নামহলে প্রবেশ

করিলাম। আহারেও তথৈবচ, তবু যাহোক করিয়া সেই কদন্ন দুটি মুখে দিয়া বাহির হইয়া আসিলাম, জামা পরিবার যোগাড় করিতেছি এমন সময় 'বিড়ির পাতা' দাদা ডাকিলেন, ও মশাই শুনছেন্—

চাহিয়া দেখিলাম যে তিনি এই কুরুক্ষেত্র ব্যাপারের মধ্যেও নিরতিশয় নিরুদ্বেগে মলিন একজোড়া তাস লইয়া একমনে সাজাই-তেছেন। কহিলেন এক্ষুনি কি বেরোতে হবে? এক হাত খেলবার সময় হবে না? এক হাত—?

সভয়ে কহিলাম, আজ্ঞে না, একদম সময় নেই, এখনিই বেরোতে হবে। এমনিই ঢের দেরী হ'য়ে গেছে।

হরেনবাবু খানকতক চিঠি হাতে করিয়া আসিয়া বলিলেন, দাদা কি বেরোচ্ছেন?···দু-একখানা চিঠি প'ড়ে শোনাতুম—

হাতজোড় করিয়া কহিলাম, সময় একদম নেই হরেনবাবু, এখনই বেরোতে হবে; ফিরে এসে না হয়—

দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া তিনি কহিলেন, নাঃ, ডাক আবার চলে যাবে কি-না!···একদিন চিঠি যেতে দেরী হ'লে বাবুদের আবার কত অভিমান!

আমি আর কথা না বাড়াইয়া কোনও রকমে বই-এর ব্যাগটা হাতে ঝুলাইয়া বাহির হইয়া আসিলাম। হোটেলের বিভীষিকাকে পিছনে ফেলিতে পারিলেই যেন বাঁচি! বাহিরে চিড়িয়াখানা আর ভিতরের রান্না-মহল নরককুণ্ড। এখানে ফিরিয়া আসিয়া আরও কতক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইবে, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম।

যাহাই হউক, ঘণ্টা তিন-চার ধরিয়া ইস্কুলে ইস্কুলে ঘুরিয়া শেষ পর্যন্ত সরকারী জেলাস্কুল হইতে বাহির হইলাম। এখন কোথায় যাইব ভাবিতেছি অকস্মাৎ একটা জনতার দিকে নজর পড়িল। কাছারী ও

ইস্কুলেব মাঝামাঝি যে মাঠ, তাহারই মধ্যে একটা নিবিড জনতা। কৌতুহল-বশতঃ পা চালাইয়া একটু অগ্রসর হইলাম। কাছে গিয়া ভিড় ঠেলিযা দেখি যে সেই 'মহাশঙ্কব তৈলের' মাথা! একটা প্রকাণ্ড ছডা গড-গড কবিয়া বলিযা যাইতেছে এবং তাহাব সঙ্গে একটা ডুগডুগিতে ইচ্ছামত চাপড মাবিতেছে। বিকট চীৎকাবে মুখ দিয়া ফেনা বাহিব হইতেছে, মুখেব সমস্ত শিরাগুলি ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিতে চায কিন্তু মামাব ভ্রূক্ষেপ নাই, সে অনবরত চেঁচাইতেছে এবং লাফাইতেছে।

মিনিটখানেক দেখিয়াই সরিয়া পডিতেছিলাম; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহাবই নজবে পডিযা গেলাম, সে অকস্মাৎ চেঁচাইয়া উঠিল, এই যে বাবুটি দেখ্ছেন—এঁয়াব ভয়ানক বাত ছিল, আজ সকালে এসে আমাব তেল লাগিযেছেন—দেখুন এখন কেমন হেঁটে বেডাচ্ছেন!

তাহাব এই নির্লজ্জ ধৃষ্টতায় স্তম্ভিত হইয়া গেলাম; কিন্তু তবুও কি কবিযা যে ভদ্রতা বক্ষা কবিয়া সেই ভিডেব মধ্যে প্রতিবাদ কবিব তাহা বুঝিতে পাবিলাম না। বাগে আমার মুখ-চোখ জ্বালা করিতে লাগিল, কোনও বকমে পাশ কাটাইয়া দৌড দিলাম। বোধহয় মামাও মানব-চবিত্রেব এই দুর্ব্বল মনোবৃত্তির খবব বাখে, সেইজন্যই এতদূব ধৃষ্টতা রাখিতেও সাহসে বাধে না।

এইবাব হোটেলে ফিবিযা দেখিলাম যে হোটেল অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন শুধু জন-দুই শিখ কয়েক বোতল হজমী জল 'শুদ্ধ শিলাজিত' বা শিলজতু লইয়া খরিদ্দাবেব আশায় বসিয়া আছে।

ঘণ্টাদুই বসিয়া বসিয়াই বিশ্রাম করিলাম। তারপর বোর্ডাবদেব আগমন শুরু হইতেই বাহির হইয়া পড়িয়া শহরের একমাত্র সিনেমায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। হউক জঘন্য বই—তবু বসিবার একটু স্থান মিলিবে ত?

সিনেমার পর আবার হোটেলে ফিরিতে হইল। কিন্তু দূর হইতেই মনে হইল যেন ডাকাত পড়িয়াছে; ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখি যে এক অদ্ভুত ব্যাপার; একজন বোধ হয় সখের যাত্রার দলে স্ত্রীলোক সাজে, সে একটা ভাঙ্গা হারমোনিয়াম সংগ্রহ করিয়া মেয়েলি স্বরে থিয়েটারের গান গাহিতেছে, তাহার সহিত হোটেলের মালিক বাঁয়া-তবলায় ঠেকা দিবার চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু তবলার বোল, লোকটির কণ্ঠ এবং হারমোনিয়ামের স্বর তিনটি তিনদিকে চলিয়াছে। এধারে এক ব্যক্তি একটা খোল লইয়া বসিয়াছে এবং কীর্ত্তন উপলক্ষ্য করিয়া তারস্বরে চীৎকার করিতেছে; তাহাতেও নিস্তার নাই—দুই দল তাস এবং একদল পাশায় মশগুল্‌।

আমি আর মুহূর্ত্ত-মাত্র অপেক্ষা না করিয়া স্টেশনে গিয়া কুলি ডাকিয়া আনিলাম এবং তাহাকে মালপত্র তুলিতে বলিলাম। রাত্রে ওখানে আহারের ইচ্ছা আমার কখনই ছিল না, থাকিলেও এই ব্যাপারে লোপ পাইত।

ম্যানেজারকে পয়সা দিতে গিয়া হরেনবাবুর সহিত আবার সাক্ষাত।

—দাদা কি চললেন নাকি? একটু দাঁড়ান, আমার ঠিকানাটা নিয়ে যান; গিয়ে চিঠি দেবেন। চিঠি দিলেই জবাব, একটুও দেরী হবে না—

অগত্যা ঠিকানা লইতে হইল কিন্তু তাহাতেও আমার দুর্ভোগের শেষ হইল না। স্টেসনের কাছে গিয়া পিছনে কাহার পায়ের শব্দ পাইলাম; ফিরিয়া দেখি মামা। একান্ত বিনীতভাবে হাতজোড় করিয়া কহিল, মশাই ত চ'লে যাচ্ছেন, নিয়ে যান না একশিশি তেল।... উপকার দেবেই—

অন্ধকারের ভয়ঙ্কর

বম্বেমেলের সেকেণ্ডক্লাস কামরা, যাত্রী আমরা পাঁচজন মাত্র। পাঁচটি বার্থই এলাহাবাদ পর্য্যন্ত রিজার্ভ করা, ট্রেণে উঠিয়াই সহযাত্রীদের নিকট হইতে এই তথ্যটুকু সংগ্রহ করিয়া খুশী হইয়া উঠিলাম। পথে কাহারও উঠিবার নামিবার হাঙ্গামা রহিল না—সমস্ত পথটি পাঁচজনে গল্প করিতে করিতে যাওয়া যাইবে।

আমার সামনের বার্থে যে ভদ্রলোক ছিলেন তাঁহার বয়স বোধহয় ৩৫।৩৬ হইবে। অত্যন্ত সুপুরুষ, মুখভাব প্রশান্ত গম্ভীর, কিন্তু চোখ-দুটি যেন সর্ব্বদা হাসিতেছে। তাঁহার পিছনের বার্থে উঠিয়াছেন এক বৃদ্ধ, বয়স পঞ্চাশ কিম্বা আরও বেশী, বোম্বে মেলের মর্য্যাদা-রক্ষার্থ সাহেবী পোষাক পরিয়া অবধি বিশেষ অস্বস্তি-ভোগ করিতেছেন, দেখিলেই বোঝা যায়। উপরের একটি বার্থে একজন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান এবং অপরটিতে একটি বাঙ্গালী মুন্সেফ, অল্প বয়স কিন্তু অজস্র বর্ম্মা চুরুটে সর্ব্বদাই নিজের গাম্ভীর্য্য বজায় রাখেন। এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানটির গাত্রবর্ণ যদিও শ্বেত, তিনি প্রথম হইতেই আমাদের সহিত বাংলায় আলাপ জুড়িয়া দিয়া আমাদের আনন্দ ও বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির লজ্জার কারণ হইয়াছিলেন।

এই গেল স্থান, কাল ও পাত্রের পরিচয়—এইবার নাটকের সূত্রপাত।

ট্রেণ ছাড়িবার পর কিছুক্ষণ খবরের কাগজটায় চোখ বুলাইবার বৃথা চেষ্টা করিয়া অবশেষে সহযাত্রীদের সহিত আলাপ শুরু করিয়া দিলাম।

সম্মুখের ভদ্রলোকটিকে প্রশ্ন করিলাম, আপনি কি এলাহাবাদেই যাবেন ?

ভদ্রলোকটি জবাব দিলেন, না। এলাহাবাদে তিনঘণ্টা থেকে প্রতাপগড় যাব। প্রতাপগড়ে আমার শ্বশুর-বাড়ী।

—এলাহাবাদে কিছু কায আছে বুঝি ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার হার্ডওয়ারের বিজ্‌নেস আছে; অমর দাস এণ্ড কোং, ক্লাইভ ষ্ট্রীট। আমিই অমর দাস। হ্যাঁ কাজ আছে—তাগাদা, মাল নিয়েছিল গতবছর, আর তাগাদা না করলে চলে না।

ওপাশের বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি সহসা আমাদের আলাপে বাধা দিয়া কহিলেন, আচ্ছা আমাদেব কামরায়-ত আর কেউ উঠছে না, দোরটা এঁটে বন্ধ ক'রে দিই না কেন ?

অমরবাবু বলিলেন, তা অবশ্য দিতে পারেন, কিন্তু তাতে আর দরকারই বা কি ?

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি মুখ বিকৃত করিয়া কহিলেন, বলা কি যায় মশাই, যা দিনকাল পড়েছে, পাঁচজনেই হয়তো ঘুমিয়ে থাক্‌ব। তখন যদি কেউ মন্দ উদ্দেশ্যে—

আমি কহিলাম, কিন্তু এই গরমে-ত আর জানলাগুলো বন্ধ করা যায় না, তার উপায় কি করবেন ?

কথাটার জবাব অমরবাবুই দিলেন, কহিলেন, জানলা আর একটু বাদে আপনিই বন্ধ করতে হবে, একবার আকাশের দিকে চেয়ে দেখুন না !

সত্যই ত ! আকাশের দিকে চাহিয়া দেখি এই অল্পসময়ের মধ্যেই

সমস্ত আকাশ কালো মেঘে ছাইয়া গিয়াছে, এবং তাহাবই মধ্যে শুরু হইয়াছে বিদ্যুতেব মাতমাতি। দুর্যোগ আসন্ন হইয়া আসিযাছে।

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া, দুটি দরজাই ভাল কবিযা ছিট্‌কিনি আঁটিয়া বন্ধ করিয়া দিলেন, তারপর পাইখানাব কপাট ঈষৎ ফাঁক কবিযা ভিতবে কেহ লুকাইয়া আছে কিনা দেখিয়া লইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিলেন।

এইবাব উপরেব সাহেবটি কথা কহিলেন, মশাই, দোর বন্ধ ক'রে ত মানুষ আট্‌কালেন ; কিন্তু যাদের দোর বন্ধ ক'রে আটকানো যায না, তাদেব বেলা কি কববেন ?

এ আবার কী ?···

বিস্মিত হইয়া আমবা সকলেই তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম। বৃদ্ধটির কল্পনা কম, তিনি প্রশ্ন কবিলেন, সে আবার কারা মশাই ?

গম্ভীর কণ্ঠে সাহেব বলিলেন, এই বোম্বেমেলেব তলায় কত লোক অকালে প্রাণ হাবিযেছে তার কি ঠিক্ আছে মশাই ? আপনি কি বলতে চান যে তাদের সেই সব ক্রুদ্ধ আত্মা কখনও মাটি ছেড়ে উঠে এই বোম্বেমেলের ওপব প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করে না ? কিম্বা তার আরোহীদের ওপর ?···এম্‌নি সব দুর্যোগেব রাত্রে ঝড়ের সঙ্গে মাটির বুক চিরে বেবিয়ে আসে, অশান্ত, অতৃপ্ত সব আত্মা ! তাবা ভীষণ ভয়ঙ্কব !

সারা দেহ কেমন যেন হিম হইয়া আসিল। উপব হইতে মুন্সেফ বাবুটি প্রায় খিঁচাইয়া উঠিলেন, কি সব ভয় দেখাতে শুরু করলেন ?

কিন্তু লক্ষ্য করিলাম যে তাঁহারও গলা কাঁপিতেছে। সাহেবটি একটা ছোট দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, ভয় দেখানোই বটে !···

নিজের জীবনে যে বিভীষিকা দেখেছি, অনুভব করেছি, তাকে ত আর আপনাদের মত 'ভয় দেখান' ব'লে উড়িয়ে দিতে পারি না। যাই হোক —এই দুর্য্যোগের রাত, আপনারা একটু সাবধান হ'য়ে থাকবেন।

উপরের মুন্সেফটি সহসা বাঙ্ক্ হইতে নামিয়া আসিলেন। তারপব বিনা অনুমতিতে আমারই শয্যার একাংশে বসিয়া পড়িয়া কম্পিত-কণ্ঠে কহিলেন, আ-আপনি কি বলতে চান যে সত্যি-সত্যিই কোনও Supernatural Beingকে আপনি দেখেছেন, এই ট্রেণের ভেতর ?

সাহেব গম্ভীর-কণ্ঠে কহিলেন, দেখেছি। এই বোম্বেমেলেব মধ্যেই—!

মুন্সেফবাবুর হাত হইতে চুরুটটা খসিয়া পড়িয়া গেল। তিনি বলিলেন, কি রকম ব্যাপারটা হয়েছিল মশাই !

সাহেব আমাদের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, শুনবেন আপনারা ?

আমরা সকলেই সাগ্রহে সম্মতি দিতে তিনিও বাঙ্ক হইতে নামিয়া আসিয়া আমাদের মধ্যে বসিলেন। ওধারে বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি তাঁহার দিকের সমস্ত জানলা-গুলি বন্ধ করিয়া দিয়া যতদূর সম্ভব কোণের দিকে সরিয়া গেলেন।

সাহেব শুরু করিলেন—

গতবছরের আগের বছরের কথা। বোম্বেমেলে চলেছি, জব্বলপুর যাবো এই রকম ইচ্ছে ছিল। ছেলেবেলায় আমার বাবা মারা যান, আমি এক বাঙ্গালী অফিসারের বাড়ী মানুষ হ'য়েছিলুম। তাঁরই ছেলে মানে আমার সেই বাঙ্গালী ভাই, জব্বলপুরে চাকরী করত। তার অসুখের খবর পেয়ে তাকে দেখতে যাচ্ছিলুম।

সেদিনও কিন্তু এমনি দুর্য্যোগ। শুধু মেঘই নয়—আমি গাড়ীতে



সাহেব আমাদের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, শুনবেন আপনারা ?

ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই মুষলধারে শুরু হ'ল বৃষ্টি, আর ঝড়। এমন বাতাসের বেগ, বার-বার মনে হ'তে লাগল যে গাড়ী বুঝি উল্‌টে যায়। শাসি-খড়খড়ি দুই-ই তুলে দিলুম কিন্তু তা ভেদ ক'রেও বাইরের গোঁ গোঁ শব্দ

কানে ভেসে আসতে লাগল, তার ওপর জানলাগুলোর ঝন-ঝনানি-ত আছেই।

কিন্তু সব-চেয়ে যেটা আমার অস্বস্তির কারণ হ'ল, সেটা হচ্ছে আমার নিঃসঙ্গতা। সমস্ত কামরাটায় আমি ছিলুম একা, বাকী চারখানা বার্থই খালি। ব্যাপারটা আপনারা ভেবে দেখুন একবার, চারিদিকের দোর-জানলা সব বন্ধ, বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে কোনও যোগ নেই, আর ঘরের ভেতরে আমি একা। যা আমার কখনও হয় না তাই হ'ল, গাড়ীতে উঠে পর্য্যন্ত আমার যেন গা ছম-ছম করতে লাগল। আমার সহযাত্রীর মত আমিও পাইখানার ভেতরটা একবার উঁকি মেরে দেখলুম, বেঞ্চের তলাগুলো দেখে এলুম কিন্তু তবুও স্থির হ'তে পারলুম না। কেউ নেই, অথচ যেন কার অজ্ঞাত উপস্থিতি মনে আতঙ্কের সৃষ্টি কবতে লাগল।

সঙ্গে কাগজ ছিল, বই-ও ছিল; উল্‌টে দেখতে শুরু করলুম কিন্তু বই বা কাগজে মন বসল না। শেষ পর্য্যন্ত অস্থির হ'য়ে গাড়ীর মধ্যেই পায়চারী শুরু ক'রে দিলুম। এম্‌নি ভাবে আরও কিছুক্ষণ কাটাবার পরই বর্দ্ধমানে গাড়ী এসে থামল। মনে খুবই ভরসা ছিল যে বর্দ্ধমানে অন্ততঃ লোকজন কেউ উঠ্‌বে—তাড়াতাড়ি সেই বর্ষার মধ্যেই দোরের শার্সি নামিয়ে প্লাটফর্ম্মের দিকে চাইলুম কিন্তু একে সেদিন সেই বর্ষায় যাত্রী খুবই কম ছিল, তাও যা উঠ্‌ল সবই থার্ডক্লাসে, সেকেণ্ড ক্লাসের দিকেও কেউ এল না।

জানলা বন্ধ ক'রে এসে বিছানায় বসলুম। জোর ক'রে একখানা এড্‌গার ওয়ালেসের নভেল খুলে বসলুম। কিন্তু পাতা-কতক পড়বার পর যখন বুঝলুম তার একটি বর্ণও আমার মাথায় যায়নি তখন আর সে

বৃথা চেষ্টা না ক'রে বইখানা সামনের বেঞ্চের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিলুম, তারপর সেই নিঃসঙ্গতা ভাঙ্গবার জন্য চেঁচিয়ে গান শুরু ক'রে দিলুম। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে বাইরে বিকট শব্দে একটা বাজ পড়ল, খুব কাছেই নিশ্চয়—কেন না মনে হ'ল যেন কানের পাশে কে একসঙ্গে তিন-চারটে কামান দাগলে, কানে তালা ধরে গেল। আরও যা হ'ল সেইটেই সবচেয়ে বিপদজনক—গাড়ীর সব ক'টা আলো একসঙ্গে দপ্‌ করে নিভে গেল।

প্রথম কিছুক্ষণ সেই অন্ধকারেই বিমূঢ়ভাবে বসে রইলুম। চেন-টানা কর্ত্তব্য কিনা ভেবে ঠিক করতে না পেরে শেষ পর্য্যন্ত ওধারের একটা জানলা খুলে দেবার জন্য উঠে দাঁড়ালুম। ভাবলুম যে এ নিবিড় অন্ধকারের চেয়ে বাইরের, এমন কি বিদ্যুতের আলোও ভাল। কিন্তু সে অন্ধকারে জানলাই বা কোন দিকে যেন ভেবে পেলুম না; যা-হোক্ ক'রে অন্ধের মত হাত্‌ড়ে হাত্‌ড়ে এগোচ্ছি এমন সময় হঠাৎ একটা দমকা হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সামনের দরজাটা খুলে গেল, আর হু-হু ক'রে বাতাস আর জলের ছাট্ ঘরের মধ্যে আসতে লাগল।

কী ক'রে এমনটা হ'ল? আমার বেশ মনে পড়ল যে আমি নিজে দু'ধারের দরজা ভাল ক'রে ছিটকিনি এঁটে দিয়ে তবে খড়খড়ি তুলে দিয়েছি। ঘরেও কেউ নেই, তবে দোর খুললে কে?

আমি চল্‌তেও পারলুম না, বসতেও পারলুম না, কাঠের মত খোলা দোরের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। হাতের কাছেই চেন, সেটাও যে টানব, তাও ক্ষমতায় কুলোল না। হাত-পা যেন বরফের মত ঠাণ্ডা হ'য়ে এল। কেন যে এত ভয় তাও ঠিক বুঝতে পারলুম না।

মিনিট খানেকের মধ্যেই বার-দুই বিদ্যুৎস্ফুরণ হ'ল। খোলা-দোরের

মধ্য দিয়ে যতটা আলো ভেতরে এল তাতেই দেখলুম যে ঘরের মধ্যে অন্ততঃ শরীরী কেউ ঢোকেনি।

তখন একটু ভরসা ক'রে দোরের দিকে এগোতে যাচ্ছি, পরিষ্কার ঘরের মধ্যেই শব্দ হ'ল বাক্স সরানোর ; আমার বেঞ্চের তলা থেকে যেন কে ট্রাঙ্কটা টেনে বার করছে ! প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠলুম, ইংরিজিতে, বাংলাতে, হিন্দিতে উপর্য্যুপরি প্রশ্ন করলুম, কে রে—কে ওখানে ? কিন্তু কোনও সাড়া নেই, আগের শব্দও থেমে গেল।

আমি ঠিক সেই অবস্থাতেই দাঁড়িয়ে রইলুম আরও মিনিট দুই। তারপর আবার একটা শব্দ। মনে হ'ল যে পাইখানার দোরটা কেউ সজোরে খুলে ফেল্‌লে, এবং সঙ্গে-সঙ্গেই আবার একটা বাক্স টানার আওয়াজ। আমি কি পাগল হয়ে গেলুম নাকি ?···বারকতক মাথায় হাত বুলিয়ে নিলুম। কিন্তু আবারও সেই শব্দ—আর ওধারে—

কালো ছায়ার মত অস্পষ্ট একটা মূর্ত্তি যেন দোরের মুখে দাঁড়িয়েছে ; অস্পষ্ট কিন্তু তবুও যেন ভয়ঙ্কর। সেদিকে চেয়েই মনে হ'লো যে এ-যেন পৃথিবীর কেউ নয়, মরণের পরপার থেকে মৃত্যু সাঁতরে এ এসেছে, অত্যন্ত অশুভ এর সংকল্প, ভীষণ এর উপস্থিতি !

একটা দারুণ বিপদের সামনে পড়েছি, আসন্ন অপঘাতের মতই ভয়ঙ্কর সে বিপদ বুঝতে পেরে প্রাণপণ শক্তিতে দেহে বল এনে চেনের দিকে হাত বাড়ালুম, সেই মুহূর্ত্তেই কিন্তু সে ছায়ামূর্ত্তি নড়তে শুরু করল। পেছনের ঘন-দুর্য্যোগ ভেদ ক'রে আকাশের যে ক্ষীণ আলো এসে পড়েছে, তারই আভাসে বুঝতে পারলুম সে এগিয়ে আসছে আমার দিকে দু-বাহু বিস্তার ক'রে—

আর এক মুহূর্ত্ত সময় নেই।···সজোরে চেনটা ধ'রে টান দিলুম।

সঙ্গে-সঙ্গে অনুভব করলুম কার একটা সর্পিল, হিম-শীতল স্পর্শ আমার কণ্ঠদেশে—

সাহেবটি মুহূর্ত্ত কয়েক দম লইবার জন্য চুপ করিলেন। গাড়ীর ভিতর সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ, কেহ যেন জোরে নিঃশ্বাস লইতেও পারিতেছে না। সাহেবই একটু পরে আবার শুরু করিলেন।

জ্ঞান হ'ল যখন তখন দেখলুম, আসানসোলে গাড়ী এসেছে, গার্ড, স্টেশন মাস্টার সকলে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছেন। এক ভদ্রলোক, বোধহয় ডাক্তার—তিনি আমায় কী একটা ইন্‌জেকসান দেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। শুনলুম যে আমি অজ্ঞান হয়ে যাবার আগে চেনটা নাকি ঠিকই টেনেছিলুম। কিন্তু গার্ড যখন গাড়ী থামবার পর আমার গাড়ীতে আসেন, তখন সব আলো জ্বলছিল, কোনটাই নেভেনি। আমার কথাটি তাঁরা বিশ্বাস করতে চাইলেন না, নার্ভাস ব্রেক-ডাউন ব'লে উড়িয়ে দিলেন এবং আসানসোল হাসপাতালে দু-দিন রেখে তবে আমাকে ছাড়লেন, কিন্তু আমার কামরায় ছিট্‌কিনিটা যে কি ক'রে ভাঙ্গল, তার কৈফিয়ৎ কেউই দিতে পারলেন না।

সাহেব গল্প শেষ করিয়া আমাদের মুখের দিকে চাহিলেন। মুন্সেফবাবু কখন যে আমার গা ঘেঁসিয়া বসিয়াছেন, তাহা এতক্ষণ ঠাওর করি নাই, তিনি প্রায় অস্ফুটস্বরে প্রশ্ন করিলেন, ছিট্‌কিনিটা কি সত্যই ভাঙ্গা ছিল ?

সাহেব ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, সত্যিই ছিল। গাড়ী শুদ্ধ লোক দেখেছে। শুধু কামরাই নয়, পাইখানার দোরের ছিটকিনিও ভাঙ্গা ছিল, অথচ যখন আমি উঠি, প্রত্যেকটা নিজের হাতে বন্ধ ক'রে দিয়ে ছিলাম।

ইহার পর কিছুক্ষণ আমরা কোনও পক্ষই কথা কহিতে পারিলাম না। একে দুর্য্যোগের রাত, তায় বোম্বেমেলের সেকেণ্ডক্লাস কামরা—মনে হওয়ায় অল্পবিস্তর সকলেরই কেমন যেন ভয় হইতে লাগিল।

কিন্তু ইতিমধ্যে বর্দ্ধমান আসিয়া পড়িল। স্টেশনের আলো, লোকজন, সীতাভোগ-মিহিদানার উপদ্রবে আমাদের সকলেরই আতঙ্ক যেন অনেকটা কমিয়া গেল। সাহেব ও মুন্সেফবাবু আবার তাঁহাদেব বার্থে উঠিলেন, অমরবাবু ছোট হাত-ব্যাগটার মধ্য হইতে একটা শিশি বাহির করিয়া কী একটি লাল ঔষধ (?) খাইলেন, বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি আগাগোড়া একটা চাদর মুড়ী দিয়া শুইয়া পড়িলেন এবং আমি শরৎবাবুর একখানা নূতন নভেলে মনোনিবেশ করিলাম।

কিন্তু বর্দ্ধমান হইতে ট্রেণ ছাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হইল মুষলধারে বৃষ্টি। এলো-মেলো বাতাসের সঙ্গে চারিদিক হইতে জলের ছাট ঘরে ঢুকিতে লাগিল। অগত্যা সব-কয়টা জানলাই রীতিমত বন্ধ করিয়া দিতে হইল। এবং সেই সময় সাহেব শুধু একটা ছোটখাট দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, ভগবানের মনে আজ আবার কী আছে কে জানে!···বর্দ্ধমানও ছাড়ল, জলও শুরু হ'ল —

কথাটা মনে পড়িতেই সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। যেটুকু ভরসা আসিয়াছিল একটি কথার সঙ্গে তাহা নিঃশেষে উড়িয়া গেল। মুন্সেফবাবু উপর হইতে কাতর কণ্ঠে কহিলেন, আলোগুলো আজ আর কেউ নিভোবেন না দয়া করে।

আমরা সকলেই সম্মতি দিলাম। শুধু তাহাই নহে, লক্ষ্য করিলাম যে আমরা প্রত্যেকেই প্রাণপণে জাগিয়া থাকিবার চেষ্টা করিতেছি।

ইহার পর অর্দ্ধঘণ্টাকাল নভেল পড়িলাম, কিন্তু ক্রমে এত ঘুম পাইতে

লাগিল যে চোখের সামনে অক্ষরগুলা লেপিয়া মুছিয়া একাকার হইয়া গেল। তখন বই নামাইয়া চাহিয়া দেখিলাম উপরের সাহেব ও আমি ছাড়া আর সকলেরই অল্প-বিস্তর নাক ডাকিতেছে। তখন আমিও ভগবানের উপর বরাত দিয়া শুইয়া পড়িলাম। বাহিরের প্রকৃতির অশ্রান্ত মাতামাতি ও লৌহচক্রের অবিরাম গর্জ্জনের মধ্যে শীঘ্রই সমস্ত চৈতন্য আচ্ছন্ন হইয়া আসিল।

অস্বাভাবিক একটা অনুভূতিতে ঘুম ভাঙ্গিয়া চাহিয়া দেখিলাম যে ঠিক আমার বিপরীত দিকের দরজা কি করিয়া খুলিয়া গিয়াছে এবং সেই উন্মুক্ত দ্বারপথে অজস্র জল ও ঠাণ্ডা বাতাস হু-হু করিয়া ঢুকিতেছে। তখন বুকের রক্ত যেন এক নিমেষেই হিম হইয়া গেল। শুধু তাহাই নয়, ঘরের মধ্যে নিবিড় অন্ধকার, সমস্ত আলোগুলি কি করিয়া নিভিয়া গিয়াছে।

এ-ক্ষেত্রে এখনই চেন-টানা কর্ত্তব্য কি-না ভাবিতেছি, এমন সময় ওধারের অমরবাবু ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিলেন, মশাই উঠেছেন? দোর কে খুললে মশাই?

তাঁহার কথায় প্রাণে ভরসা আসিল। আর যাহাই হউক একা ত নই, ভয়টা কিসের?

জবাব দিতে যাইব, এমন সময় পরিষ্কার একটা শব্দ কানে গেল, কে যেন বেঞ্চের নীচে হইতে বাক্স টানিয়া লইতেছে—। এবং একটু পরেই দেখিলাম দ্বারের কাছে ছায়ামূর্ত্তির মত কী একটা—

উপর হইতে আঁ-আঁ শব্দ করিতে করিতে মুন্সেফবাবুটি হুড়মুড় করিয়া আসিয়া পড়িলেন আমাদের ঘাড়ে এবং ওধারের বেঞ্চে যেখানে বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি ছিলেন সেখান হইতেও গোঁ গোঁ শব্দ হইতে লাগিল।

ইতিমধ্যে অমরবাবুও গড়াইয়া মেঝেতে পড়িয়া ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

মিনিট-পাঁচেক যে কী খণ্ড-প্রলয়ের মধ্য দিয়া কাটিল তাহা এখন আর বর্ণনা করিতে পারিব না কিন্তু তাহার পরই ট্রেণ একটা স্টেশনের মধ্যে ঢুকিতে আরম্ভ করায় বাহিরের কোলাহল ও আলোর আভাসে আমাদের সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল।

তখন তিনজনে জড়াজড়ি করিয়া কোনও রকমে সুইচটা টিপিলাম। টিপিবার সঙ্গে সঙ্গে আলো জ্বলিয়া উঠিল—এবং আলোর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভরসা।

বাহিরে চাহিয়া দেখিলাম—সেটা গোমো স্টেশন, এবং ভিতরে চাহিয়া দেখিলাম যে ওধারের বেঞ্চের বৃদ্ধটির ফিট হইয়াছে। আরও যাহা দেখিলাম তাহার ফলে চেঁচামেচি শুরু হইল এবং অবিলম্বে গার্ড, স্টেশন মাস্টার প্রভৃতি সকলেই আসিয়া জুটিল।

কি দেখিলাম ?

আমাদের তিন-চারিটি বাক্স, স্যুটকেশ এমন কি অমরবাবুর মণিব্যাগ সুদ্ধ আমাদের সহযাত্রী সাহেবটি অন্তর্হিত হইয়াছেন। একেবারে যেন উপিয়া গিয়াছেন।...

বর্ষারাতের কাব্য

সন্ধ্যা তখনও উত্তীর্ণ হয় নাই। কিন্তু মালতী ইতিমধ্যেই ঘরের মধ্যে প্রদীপ জ্বালিয়া চুপ করিয়া দরজার ধারে বসিয়াছিল। তাহার কারণ সকাল হইতে সেই যে বৃষ্টি নামিয়াছে, সে বৃষ্টি এখনও থামে নাই, সন্ধ্যার বহু পূর্ব্বেই একটা ঝাপ্‌সা অন্ধকার শহরের বুকে নামিয়া আসিয়াছে। গলিতে জল দাঁড়াইয়াছে প্রায় এক হাঁটু, পথিকের পথ-চলাচল এক রকম বন্ধই, বিশেষ প্রয়োজনে না পড়িলে এ অবস্থায় কেহ বাহির হয় না। কিন্তু তবু মালতী যেন কিসের আশায় সেই গলির দিকেই চাহিয়া বসিয়াছিল।

মালতী বিধবা, তাহার বয়স বোধ হয় চব্বিশ-পঁচিশ হইবে কিংবা আরও একটু বেশী। তাহার সর্ব্বাঙ্গে যেন বৈধব্যের করুণ বৈরাগ্য বিরাজ করিতেছে, কোথাও কোন অলঙ্কারের চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই, গায়ের রঙ্‌ তাহার উজ্জ্বল শ্যাম, মুখ-চোখের মধ্যেও তেমন কোন বৈশিষ্ট্য নাই; কিন্তু তাহার দেহখানি ঘিরিয়া এমন একটি সুকুমার-শ্রী বিরাজিত যে, তাহার দিকে চাহিলেই যেন পুলকে মুগ্ধ হইয়া যাইতে হয়।

বহুক্ষণ সেই একভাবে বসিয়া থাকিবার পর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মালতী উঠিয়া দাঁড়াইল। কবাট বন্ধ করিতে যাইবে এমন সময়ে গলির মোড়ে একটা মোটর থামিবার শব্দ পাইয়া সে যেন চমকিত হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি দ্বারের কাছ হইতে সরিয়া ঘরের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইল।

মালতীর আশা বা আশঙ্কা যে মিথ্যা নয় তাহা একটু পরেই

বোঝা গেল। এক ভদ্রলোক সেই জলের মধ্যেই ছাতি মাথায় দিয়া তাহারই ঘরের রকে আসিয়া উঠিলেন। মুহূর্ত্তকাল বাহিরে একটু ইতস্তত করিয়া মৃদুকণ্ঠে ডাকিলেন, মালতী!

মালতী মাথার উপর কাপড়টা টানিয়া দিয়া কহিল, আসুন।

ভদ্রলোক ছাতিটা বাহিরে রাখিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। মোটরে আসিলেও তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ইতিমধ্যেই ভিজিয়া গিয়াছে, দেশী কাপড়ের কোঁচা রাস্তার কাদাজলে গৈরিক বর্ণ ধারণ করিয়াছে আর দামী সোয়েডের জুতার যে কি অবস্থা তাহা বর্ণনা না করাই ভাল।

মালতী নিঃশব্দে আলনা হইতে একটা কাচা তোয়ালে আনিয়া দিয়া কহিল, জলটা যতটা পারেন মুছে ফেলুন। ভিজে জুতোটাও ছেড়ে ফেলুন—

ভদ্রলোক তোয়ালে হাতে করিয়া বলিলেন, মালতী, তুমি আমায় অনেক কষ্ট দিয়েছ কিন্তু এতেও কি প্রায়শ্চিত্ত হয়নি?

মালতী নতমুখে জবাব দিল, ওসব কথা আর কেন তুলছেন মিছি-মিছি?……মাথা-গা মুছে নিন্—জলে ভিজলেই আপনার শরীর খারাপ হয়!

ভদ্রলোক আবেগকম্পিতকণ্ঠে কহিলেন, চারখানা চিঠি দিলুম তার জবাব দিলে না, খোঁজ নিয়ে জানলুম যে তোমার দাদার বাড়ীতেও যাও নি, কি কষ্টে যে এ ঠিকানা খুঁজে বার করেছি তা আমিই জানি!

মালতী নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল, জবাব দিল না।

তিনি পুনশ্চ কহিলেন, ভুল সকলেরই হয় মালতী, আমিও ত মানুষ। কিন্তু তুমি কষ্টও তার জন্য কম দাওনি ত! এতেও কি প্রায়শ্চিত্ত হয়নি?



ভুল সকলেরই হয় মালতী আমিও ত মানুষ।

মালতী কহিল, কিন্তু আপনার অসুখ করবে যে দেবেনবাবু!

দেবেনবাবু কহিলেন, তা করুক—আর সেও ত তোমারি হাতে, তোমাকে না নিয়ে আর বাড়ী ফিরব না, আমি প্রতিজ্ঞা করেছি।

মালতী ব্যাকুল হইয়া কহিল, সে হবে, কিন্তু দোহাই আপনার

আপনি গা-মাথা মুছুন! নইলে আমি কিছুতেই সুস্থির হ'তে পারছি না।

দেবেনবাবু আরও দুই-পা তাহার কাছে সরিয়া আসিয়া বলিলেন, তুমি চল তাহ'লে, আমি একেবারে বাড়ীতে ফিরে কাপড় ছাড়ব।

বিস্ময়-ব্যাকুলকণ্ঠে মালতী কহিল, সে কি, এক্ষুণি? এইভাবে?

দৃঢ়কণ্ঠে দেবেনবাবু জবাব দিলেন, বলেছি ত, তা নইলে আমিও আর ফিরব না! তোমাকে হারিয়ে অবধি আমার যে কি দুর্দ্দশায় দিন কাট্‌ছে, তা তুমি ভাবতেও পারবে না মালতী!

মুহূর্ত্ত দুই মালতী কেমন যেন বিহ্বলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, চলুন, যাচ্ছি! শুধু একবার বাড়ী-ওয়ালাকে ব'লে আসি—

দেবেনবাবু ছাতাটা তুলিয়া লইয়া রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইলেন, মিনিট দুই পরে মালতী গায়ে একটা চাদর দিয়া বাহির হইয়া আসিল।

দুইজনে মোটরে আসিয়া বসিতেই সোফেয়ার গাড়ী ছাড়িয়া দিল। সেই প্রবল বারিধারার মধ্যে গাড়ী ছুটিয়া চলিল হু-হু করিয়া—গাড়ীর দুইটি মাত্র আরোহী কিন্তু নির্ব্বাক। সমস্ত পথটা দুজনেই এম্‌নি নীরবে বসিয়া রহিল, কেহ একটি শব্দ পর্য্যন্ত করিল না।

এ-পথ সে-পথ ঘুরিয়া অবশেষে গাড়ী বালিগঞ্জের একটা বিরাট বাড়ীর সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। দেবেনবাবু গাড়ী হইতে নামিয়া কহিলেন, এস মালতী—

মালতী তবুও যেন একটু ইতস্তত করিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দেবেনবাবুর পিছনে পিছনে বাড়ীতে আসিয়া ঢুকিল।

সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতেই মলিনা ছুটিয়া আসিল, হ্যাঁগা পেলে কি মালতীকে ?

দেবেনবাবু কৌতুকপূর্ণস্বরে কহিলেন, চেয়ে দেখ না !

মলিনা কহিল, আ বাঁচলাম। সে উড়ে ঠাকুরটাও এবেলা পালিয়েছে, কি দুর্ভাবনা যে হয়েছিল তা বলবার কথা নয়। এতগুলো লোক খায় কি ? আচ্ছা, তাও বলি মালতী, জানই ত যে আমি একমিনিট আগুন-তাতে যেতে পারি না, জেনেশুনে এমন কষ্ট দেওয়া কি ঠিক হয়েছে তোমার।

দেবেনবাবু কহিলেন, তবু ভাগ্যিস্ ও আর কোথাও কাজে লাগেনি, তাহলে যে কী করতুম, ভাবতেও আমার গা শিউরে ওঠে।

দেবেনবাবুর স্ত্রী মলিনা জবাব দিল, আমি ঠিকানা পেলে গিয়ে জোর ক'রে ধরে আনতুম, তারা আমার কি করত ?

মালতী লজ্জিত হাসিমুখে রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল।*

*O Henry হইতে।

ব্ল্যাকমেল

প্রথম যেদিন অপূর্ব্ব তাহার ছোট কাঠের বাক্স এবং প্রকাণ্ড একটা বিছানা লইয়া ভালমানুষের মত আমাদের মেসে আসিয়া হাজির হইল সেদিন কে জানিত যে ওই রোগা লিকলিকে মানুষটির মধ্যে এত শয়তানী ঠাসা আছে। অত্যন্ত শীর্ণ দেহ, ধনুকের মত ঈষৎ বাঁকা, উজ্জ্বল দু'টি চোখের দৃষ্টি অতি প্রখর; প্রথমটা দেখিয়া মনে হইয়াছিল বয়স বোধ হয় চল্লিশের কাছাকাছি পৌঁছিয়াছে! অবশ্য পরে বুঝিয়াছিলাম যে অত ত হয় নাই বরং ত্রিশেরও বোধকরি কিছু কম হইবে।

আমারই ঘরে ম্যানেজার ছিলেন, চাকর সঙ্গে আসিয়া দেখাইয়া দিলে ছোট একটি নমস্কার করিয়া বিনা দ্বিধায় আমার বিছানায় বসিয়া পড়িল, তাহার পর নিতান্ত বিনীতভাবেই কহিল, "ওয়াণ্টেড মেম্বারস্" লেখা দেখে এলাম।

ম্যানেজার নিজের ম্যানেজারী গাম্ভীর্য্যের সহিত তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, কোথা থেকে আসছেন আপনি?

সে মৃদু হাসিয়া জবাব দিল, আর একটা মেস থেকে নিশ্চয়ই। মেসেই ত বছর-বারো কাটল।

ম্যানেজার একটু ইতস্তত করিয়া বলিলেন, সেখান থেকে কেন চলে আসতে চান, জানতে পারি কি?

প্রশান্তমুখে সে জবাব দিল, না, পারেন না।

ম্যানেজার বিস্মিত হইলেন, বোধ করি কিছু বিরক্তও হইলেন, তিনি কহিলেন, তাহলে মশাই—

অপূর্ব্ব হাতের ইঙ্গিতে তাহাকে নিরস্ত করিয়া কহিল, সেখান থেকে টাকাকড়ি না দিয়ে পালিয়ে আসছি কিনা, এইটুকু জানতে চান ত? তা আপনি কি আশা করেন যে সে রকম কিছু ঘটলেই আপনাকে সে কথা জানাব? নিশ্চয়ই একটা বানিয়ে বলব, এই ত! কাজ কি আপনার কতকগুলো মিথ্যে কথা শুনে, অসুবিধা হচ্ছিল, এই ঢের।

ম্যানেজার বিব্রতভাবে আমার দিকে চাহিয়া কহিলেন, কিন্তু এখানে কি আপনার চেনাশুনা কেউ আছে?

সে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, কেউ না। তবে একদিন থাকলেই চেনা-শুনো হ'য়ে যাবে, এমনি ক'রেই ত আলাপ-পরিচয় হয়।

অগত্যা ম্যানেজার চুপ করিলেন। বহুদিন যাবৎ তিনচারটি সিট্ খালি থাকায় অত্যন্ত অসুবিধা হইতেছিল, সুতরাং আমরা গোপনে ম্যানেজারকে চোখ টিপিয়া দিলাম। তিনি বার-দুই মাথা চুলকাইয়া বলিলেন, তাহলে সীট যা আছে দেখে আসুন।

অপূর্ব্ব জবাব দিল, ও আর দেখতে হবে না, এমনি পছন্দ হয়েছে আমার। আপনাদের বাড়ীটা দিব্বি—

আমরা আরও বিস্মিত হইলাম। কিন্তু তখনও বিস্ময়ের শেষ হয় নাই, সে অধিকতর বিস্মিত করিয়া দিয়া কহিল, নীচে বাক্স আর বিছানাটা আছে আপনাদের চাকরকে বলুন একটা সীটে রেখে দিতে।

ম্যানেজার আর থাকিতে পারিলেন না, আপনি কি একেবারে বাক্স-বিছানা নিয়েই বেরিয়ে পড়েছেন নাকি?

স্মিতমুখে ঘাড় নাড়িয়া সে কহিল, আজ্ঞে হ্যাঁ, সকালে উঠে কেমন মনে হ'ল যে মেসটা আর ভাল লাগছে না, ব্যাস, একেবারে তাদের সঙ্গে হিসাব-নিকাশ চুকিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। জানি বাসা একটা

মিলবেই, কলকাতা শহরে মেসের অভাব কি? রাস্তার দুধারে "ওয়াণ্টেড মেম্বারস্" লেখা—

ম্যানেজার বলিলেন, আমাদের কিছু টাকা এ্যাড্‌ভান্স করা নিয়ম আছে।

সে একেবারে পকেট হইতে একটা হাতে বোনা থলি বাহির করিয়া কহিল, বিলক্ষণ! সে নিয়ম ত সব জায়গাতেই আছে, আপনাদের কত পড়ে মাসে?

ম্যানেজার কহিলেন, সীট ভাড়া মাসে পাঁচ টাকা লাইট সুদ্ধ, আর বাকী খরচা প্রায় টাকা আষ্টেক পড়ে—

চট্ করিয়া অপূর্ব্ব হিসাব করিয়া ফেলিল, মাসে তেরো টাকা। আজ হল চোদ্দই আর সতেরদিন বাকী, তা'লে এমাসে আমার পড়ছে সাতটি টাকা, তাহ'লে তাই নিন্, এই কটা দিনের খুচরো খরচটাই নিয়ে নিন—

সে সাতটি টাকা ম্যানেজারের হাতে গণিয়া দিল।

সেইদিন হইতে অপূর্ব্ব আমাদের মেসে কায়েম হইল। এই অদ্ভুত মেম্বারটির সম্বন্ধে আমাদের দু'চারজনের মধ্যে কিছু কানাঘুষা চলিলেও আর বিশেষ কোন আলোচনা হইল না এবং দিন-দুইয়ের মধ্যেই আমরা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিলাম।

কিন্তু তিন-চারদিন যাইতে না যাইতেই আমাদের ভুল ভাঙ্গিল।

নন্দদা আলীপুরের উকিল, ওকালতীতে এখনও যথেষ্ট পশার না হওয়ায় সকালে বিকালে গোটা দুই টিউশানী করিয়া এখানকার এবং দেশের খরচা চালান। ভদ্রলোক যেমন কৃপণ, তেমনি সৌখীন, বাথগেটের ক্যাষ্টর অয়েল মাখেন শিশির গায়ে কাগজের দাগ দিয়া এবং

প্রত্যহ গণিয়া রাখেন পাছে কেহ চুরি করিয়া মাখে। এ হেন নন্দদার উপরই আক্রমণটা প্রথম শুরু হইল। ভদ্রলোক অকস্মাৎ একদিন আসিয়া দেখেন তিন-চারটি দাগ তাঁহার খালি হইয়া গেছে। তিনি চীৎকার করিয়া গালাগালি দিয়া বাড়ী মাথায় করিলেন। চাকর-বাকরদের আজই জবাব দেওয়া হইবে কিনা এমন কথাও আমরা ভাবিতেছি, এমন সময়ে অপূর্ব্ব ধীরে সুস্থে প্রবেশ করিল।

সে যেন কিছুই শোনে নাই এবং আমাদের কোন প্রকার চাঞ্চল্য লক্ষ্য করে নাই, এমনি সহজ ভাবেই কহিল, মাইরি নন্দদা আপনার ক্যাষ্টর-অয়েলটা বেশ। আমি আগে আর একটা ব্যবহার করতুম—গন্ধটা পছন্দ হ'ত না, এবার দেখছি এই তেলই ধরতে হবে।

বলা বাহুল্য আমরা বিস্ময়ে স্তম্ভিত। নন্দদা রাগে তোৎলা হইয়া গেলেন, আ-আ-পনিই আমার তেল ঢেলে নিয়েছেন? কো-কোন সাহসে আপনি একাজ—

বাধা দিয়া অপূর্ব্ব কহিল, আপনি নয় নন্দা, আপনি নয়। 'তুমিই' বলবেন। আমি ঢের ছোট।

নন্দদার মুখ অসহ্য ক্রোধে লাল হইয়া উঠিল, তিনি কহিলেন, কিন্তু একি অন্যায় কথা।

বিলক্ষণ। অন্যায় কি? আপনার খুশী হ'লে আমার তেল মাখবেন, আমার ইচ্ছে হ'লে আপনার তেল মাখব—এতেই ত হৃদ্যতা জমে উঠবে। এটা কি? এসেন্স বুঝি? গন্ধটা ত ভাল নয়?

এই বলিয়া সে নিজের জামায় খানিকটা এসেন্স ঢালিয়া লইয়া গন্ধটার প্রচুর নিন্দা করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল।

সত্য কথা বলিতে কি নন্দদার দুর্গতিতে আমরা মনে মনে একটু

খুশিই হইয়াছিলাম বলিয়া বিশেষ উচ্চবাচ্য করিলাম না। কিন্তু সেটা যে মাত্র উপদ্রবের শুরু তাহা তখন কে জানিত? পরদিন সকাল বেলা উঠিয়া দেখি আমার বাহারী চটি জুতাটি নাই। ঘর, বাহির, তক্তাপোষের তলা, সর্ব্বত্র বার-দুই তিন করিয়া খুঁজিয়া গলদ-ঘর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছি এমন সময় চটাস্ চটাস্ শব্দে দিগ্বিদিক প্রকম্পিত করিয়া অপূর্ব্বচন্দ্র হাজির। অম্লানবদনে চটিজুতাটি আমার সামনে ছাড়িয়া দিয়া কহিল, বাহারী জুতো দেখে লোভ হ'ল, তা এর ভিতর যে এমন ফক্কিকার কে জানত? দুটো পয়সা তোমার বোধহয় লোকসান করলাম ভাই। আবার স্ট্র্যাপটা জুড়ে নিতে হবে।

জুতাটার দুর্গতিতে আমার চোখে জল আসিয়া গেল। শুধু স্ট্র্যাপটা ছিঁড়িয়া যায় যাই, পাঁক ও কাদা লাগিয়া দুইটী পাটীই বিবর্ণ হইয়া গেছে। কিন্তু বিস্ময় ও ক্রোধ দমন করিয়া তিরস্কারের ভাষা খুঁজিয়া পাইবার আগেই সে শিস্ দিতে দিতে বেশ প্রফুল্ল মনেই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সেই দিন সন্ধ্যাবেলায় মনোহরদা একটু সকাল সকাল বাসায় ফিরিয়া সবে দুটি ডিম ভাজিয়া নির্জ্জনে আহার করিবার উপক্রম করিয়াছেন, বুড়োমানুষ, ডিম দুটা বেশী করিয়া না খাইলে শীঘ্রই মারা যাইবেন এই তাঁহার ধারণা। এমন সময়ে অপূর্ব্ব কোথা হইতে আসিয়া একেবারে তাঁহার বিছানায় চাপিয়া বসিল, বা—দিব্বি ডিম-ভাজার গন্ধ বেরিয়েছে, ওটা কি চায়ের জল চাপল বুঝি? অমনি আমার জন্যেও এক কাপ নেবেন বেশী ক'রে। গাটা কেমন যেন মাটি-মাটি করছে।

কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই ডিমভাজার অর্দ্ধেকটারও বেশী তুলিয়া

লইয়া মুখে পুরিয়া দিল। বলা বাহুল্য মনোহরদা বাধ্য হইয়াই আর এক কাপ চা করিয়া দিলেন। কিন্তু রাত্রি বেলায় আমাদের কাছে ঘটনাটি বিবৃত করিবার সময়ে ডিমের শোকে তাঁহার চোখে জল আসিয়া গেল।

ইহার পর এ উপদ্রব নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া উঠিল। একদিন দেখা গেল, সুকুমারের কাচানো টার্কিশ তোয়ালেখানা জুতার সহিত খাটের নীচে একত্র পড়িয়া আছে, তাহার পরের দিন তারিণী-দার বাঁধানো ছড়িটি দ্বি-খণ্ডিত অবস্থায় কলতলায় কুড়াইয়া পাওয়া গেল। সবচেয়ে বিপদের কথা হইল এই যে, তাহাকে কোনরূপ তিরস্কারের চেষ্টা-মাত্রও করা যায় না, যতকিছুই বলা হউক না কেন, সে নির্ব্বিকার চিত্তে হয় চোখ বুজিয়া পড়িয়া থাকে নয় কোথাও বাহির হইয়া যায়।

অবশেষে সেদিন সন্ধ্যার সময় অফিস হইতে ফিরিয়া সংবাদ পাওয়া গেল যে রাত্রির জন্য রাখা মাছভাজা হইতে তিন চারখানা সে জোর করিয়া খাইয়া গিয়াছে এবং এবেলা সেই ক'জনের ভাগ্যে ঝোলের মাছ মিলিবে না। সেই দিনই আমরা স্থির করিলাম যে অবিলম্বে একটা কিছু প্রতিকার করা প্রয়োজন। ম্যানেজার রামবাবু কহিলেন, আপনারা সব চলুন মশাই, আজই ওকে নোটিশ দিয়ে আসি, কাল সকালেই যাতে চলে যায়।

সকলেই প্রস্তুত হইয়া উঠিয়া আসিল। নন্দদা সক্রোধে কহিলেন, চব্বিশ ঘণ্টার একটি মিনিট বেশী নয়, তা সে যতই কান্নাকাটি করুক।

আমরা সদলবলে যখন তাহার ঘরে গেলাম তখন সে আকাশের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বিছানায় পড়িয়া আছে। আমাদের দেখিয়া

কিছুমাত্র বিচলিত হইল না বরং উঠিয়া বসিয়া চাদরটা ঠিক করিয়া দিয়া কহিল, বসুন।

তারপর সহসা নন্দদার প্রতি চাহিয়া চমকিয়া বলিয়া উঠিল, ইস, নন্দদা করেছেন কি? দেখি আপনার ডান হাতটা—

বলিয়া তাঁহার সম্মতির অপেক্ষামাত্র না করিয়া ডান হাতখানি লইয়া মিনিট খানেক ধরিয়া নিরীক্ষণ করিল, তাহার পর সেটা ছাড়িয়া দিয়া নিমিলিত নেত্রে শুধু কহিল, তাইত!

নন্দদার জ্যোতিষশাস্ত্রে অসামান্য বিশ্বাসের কথা সর্ব্বজন-বিদিত, তিনি বিবর্ণ মুখে কহিলেন, কি দেখলে বল ত? ব্যাপাব কি?

অল্প কিছুক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া শূন্যে চাহিয়া থাকিয়া অপূর্ব্ব কহিল, বৃহস্পতি তুঙ্গি—ঠিক কি করে বলা যায় না, তবে ভোগাবে খুব। সময় আপনার খুব খারাপ পড়েছে।

বৃহস্পতিটা কি বস্তু যদিবা ঠাহর করিতে পারি, 'তুঙ্গী' শব্দের কোন অর্থই আমাদের জানা নাই। কিন্তু নন্দদা দস্তুরমত বিচলিত হইয়া উঠিলেন। তিনি প্রায় কাঁদো-কাঁদো হইয়া কহিলেন, কি হবে ভাই তাহ'লে! একটা নবগ্রহ যাগ করি? আমার সময় সত্যিই খুব খারাপ পড়েছে, দেশে রোজ অসুখ-বিসুখ লেগেই আছে, আবার শুনছি জাঠ্‌তুতো ভায়েরা মকদ্দমা করবে—

অপূর্ব্বর বিদ্যাবত্তার এই অকাট্য প্রমাণ পাইয়া আমরা সকলেই অভিভূত হইয়া পড়িলাম। যে কাজে আসিয়াছিলাম তাহা প্রায় সকলেই ভুলিয়া গিয়া আরও কাছে সরিয়া বসিলাম।

নন্দদার মুখের দিকে চাহিয়া অপূর্ব্ব হাসিয়া কহিল, দেখুন নন্দদা, নবগ্রহ যাগ ঠিক ঠিক করতে পারে এমন একজন বামুনও এখন পাবেন

না। যেই বলুক যে ঠিক ক'রে দেব—সেই আপনাকে ঠকাবে, শুধু শুধু পয়সা খরচ। তার চেয়ে এক কাজ করুন, একটা নীলা আর একটা গোমেধ কিনে রূপো দিয়ে বাঁধিয়ে নিয়ে হাতে পরুন। আর ফি মাসের শুক্লপক্ষে একটা করে শনিবারের উপোস করুন। গ্রহরাজ প্রসন্ন হ'লে আর ভয় কাকে?

নন্দদা আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন কিন্তু কনুয়ের গুঁতোয় তাঁহাকে ঠেলিয়া দিয়া তারিণীদা সামনে আসিয়া বসিলেন। ডান-হাতখানি প্রসারিত করিয়া কহিলেন, দেখ দেখি ভাই, আমার হাতটা একবার—

অপূর্ব্ব কিন্তু তাঁহার হাতটা ঠেলিয়া দিয়া কহিল, আপনার হাত দেখে কি করব, ঘোড়া রোগ না সারলে আপনার কিছু হবে না।

তারিণীদা যে 'মাঠে' যাইতেন একথাটা মেসের অল্প লোকই জানিত, মানুষটি অত্যন্ত চাপা ছিলেন। কিন্তু এ ব্যক্তি এই আট দশদিনের মধ্যে এ সংবাদ জানিল কি করিয়া? তবে কি এ সর্ব্বজ্ঞ।

আমরা বিস্মিত নেত্রে চাহিয়া রহিলাম, ইতিমধ্যে একটু যেন শ্রদ্ধার সঞ্চারও হইয়াছিল। কিন্তু আমাদের সে শ্রদ্ধা ও বিস্ময়কে শতগুণ বর্দ্ধিত করিয়া সে কহিল, পরশু ইয়লো ডায়মণ্ড ধরলেন না কেন? তাই ধরবেন বলেই ত গিয়েছিলেন।

তারিণীদা স্তম্ভিত। বহু কষ্টে কহিলেন, কে-কেমন করে জানলে ভাই।

অপূর্ব্ব শুধু হাসিল। তারপর সহসা সুকুমারের হাতঘড়িটার দিকে চাহিয়া কহিল, ইস তাইত। আটটা বেজে গেছে? তাহ'লে আমি এখন একটু উঠি, কি বলুন?

এবং উত্তরের অপেক্ষামাত্র না করিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

আমাদের সশ্রদ্ধভাব তখনও কাটে নাই। সুকুমার কহিল, লোকটা সাধক টাধক হবে, আর সেই জন্যই বোধ হয় অত খেয়ালী।

তারিণীদা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, কাক চরিত্র।

এমন কি নন্দদাও অভিভূত হইয়া কহিলেন, যাই বল কিন্তু সাচ্চা লোক!

ইহার পর আরও কয়েকটা দিন একরূপ কাটিল। উপদ্রব যে দুই-একটা না হইত তাহা নয় কিন্তু সেদিন রাত্রের ব্যাপারের পর আর কোন কথা কহিবার সাহস কাহারও ছিল না। তবে নাকি সাধনা বা কাক চরিত্রের উপরেও একটা বস্তু আছে এবং সেটা টাকা, তাই যখন মাসেব পনেরো দিন কাটিবাব পরও অপূর্ব্ব একটি পয়সা বাহির করিল না, তখন ম্যানেজার অগত্যা ভয়ে ভয়ে একদিন তাগাদা করিলেন।

সে সস্মিতমুখে ম্যানেজারের মুখেব দিকে চাহিয়া কহিল, আমার কাছে টাকাটা ঠিক ও ভাবে নিতে পারবেন না রামবাবু, ও এখন জমুক। এক সময়ে আমি সবটা একসঙ্গে ফেলে দেব।

রামবাবুর ললাটে ঘাম দেখা দিল। তিনি কহিলেন, সে কি মশায় এ ত আমার ব্যবসা নয়। আমি সব পেমেণ্ট দেব কোথা থেকে? আপনাদের নিয়েই ত আমায় দিতে হবে!

সে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, তা বুঝেছি, কিন্তু উপায় কি বলুন?

তাহার পরই সোজা পাশ কাটাইয়া উপরে চলিয়া গেল। রাম-বাবু তৎক্ষণাৎ আমাদের ঘরে ছুটিয়া আসিলেন এবং প্রায় কাঁদো-কাঁদো হইয়া কহিলেন, আমি তখনই জানতুম ও লোক সুবিধের নয়। হয়

ওকে এখনি গলাধাক্কা দিয়ে তাড়ান, নয় ত আমার ম্যানেজারি ফিরিয়ে নিন্ আপনারা। আমি ছাঁপোষা মানুষ, আমার অত ঝঞ্ঝাটে কাজ নেই।

সকলে নীরবে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। আমি সভয়ে কহিলাম, ঠাট্টা করেনি ত?

খিঁচাইয়া উঠিয়া রামবাবু বলিলেন, ঠাট্টা কি সত্যি জেনে আসুন না মশায়? অত-শত আমি বুঝি না।

তখনই আর একটি দল সংগ্রহ করিলাম। এবারে আর না ব্যবস্থা করিলেই চলিবে না। ঘর হইতে টাকা দিয়া কে উহাকে খাওয়াইবে।

সে দিনও সে বিছানায় পড়িয়া বিড়ি টানিতেছিল, আমাদের দেখিয়া না উঠিয়াই কহিল, আসুন, কি খবর?

নন্দদা অপেক্ষাকৃত মোলায়েম কণ্ঠে কহিলেন, তোমার খরচটা ভাই কিছু দিতে হচ্ছে যে। রাম নইলে পেরে উঠবে কেন?

খানিকটা ধোঁয়া উপরের দিকে ছাড়িয়া দিয়া সে জবাব দিল, দেখি, মাস-দুই পরে আর একটা ব্যবস্থা করতেই হবে—

লোকটা নিজে উন্মাদ না আমাদেরই পাগল বানাইবার চেষ্টা করিতেছে ঠিক বুঝিতে না পারিয়া অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলাম। তখন সে-ই অনুগ্রহ করিয়া ব্যাখ্যা করিল, কোথা থেকে এখন দেবো বলুন, টাকাটা পাওয়া চাই ত?

তখন আমাদের মনে পড়িল এ লোকটি ঠিক কি করে তাহা আমরা কেহই জানি না। দুই-একদিন প্রশ্ন করিয়াও সদুত্তর পাওয়া যায় নাই। রামবাবু তিক্ত কণ্ঠে কহিলেন, আপনি কি করেন জানতে পারি কি?

সে উদাসভাবে ছাদের দিকে চাহিয়া জবাব দিল, আপাততঃ কিছুই না।

কী সর্ব্বনাশ!

তারিণীদা প্রশ্ন করিলেন, তার মানে?

এইবার সে উঠিয়া বসিল। তারিণীদার মুখের দিকে চাহিয়া বেশ প্রফুল্লকণ্ঠেই কহিল, বার মাস চাকরী করতে আমার ভাল লাগে না। যখন খুব পয়সা কড়ির অভাব হয় তখন একটা চাকরী নিই, আবার খুচরো দেনাগুলো শোধ হয়ে গেলেই একদিন ছেড়ে দিই। বারো মাস ভূতের মত খেটে লাভ কি বলুন?

নন্দদা কহিলেন, তোমার ইচ্ছামত কে চাকরী দেবে বাপু শুনতে পাই কি?

সে কহিল, সবাই ত' দেয়। ঐ সুকুমারদেরই অফিসে গত ডিসেম্বর থেকে এপ্রিল পর্য্যন্ত কাজ করে এসেছি কিনা খোঁজ করতে বলুন না। জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবেন যে তারা আমাকে ছাড়ায় নি, আমিই ছেড়ে দিয়েছি—

রামবাবুর এবার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল, তিনি অত্যন্ত রুক্ষস্বরে কহিলেন তা বাপু অত সৌখীন মেম্বার আমাদের দরকার নাই। আপনি কালকেই অন্যত্র চেষ্টা দেখবেন।

কিন্তু এ অপমানেও অপূর্ব্ব বিচলিত হইল না। সে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, সে সুবিধা হবেনা, আপনার অনুরোধ রাখতে পারব না রামবাবু।

রামবাবু গরম হইয়া বলিলেন, তার মানে?

অপূর্ব্ব পুনশ্চ শুইয়া পড়িয়া কহিল, আমি এখানেই বেশ আছি।

এবার আমাদেরও গা তাতিয়া উঠিল। আমি বলিলাম, কিন্তু এ কি আপনার গায়ের জোর নাকি?

বামবাবু কহিলেন, গায়েব জোব দেখাতে চায় ত পুলিশ ডাকতে হবে। তাদেব কাছেই গায়েব জোব দেখায় যেন!

কিন্তু তবুও অপূর্ব্বব মুখেব হাসি মিলাইল না, সে কহিল ডাকুন না পুলিশ। কিন্তু কি বাবদ পুলিশ ডাকবেন শুনতে পাই কি? মোটে একমাস ত আমি এসেছি, তাব মধ্যে ও মাসেব পনেব দিনেব টাকা শোধ কবে দিয়েছি, এ মাসেব বাকী কদিন না গেলে এমন কি ছোট আদালতেও নালিশ কবতে পাবেন না, পুলিশ ডাকা ত দূবের কথা।

সুকুমার ওপাশ হইতে বলিয়া উঠিল, আপনি আমাদের ডিসটাব্ব কবছেন, এই জন্যই পুলিশ ডাকতে পাবি।

বেশ ডাকুন।

এই বলিয়া সে ওপাশ ফিবিয়া শুইযা কহিল, এখন আপনাবা যান, আমার ভাবী ঘুম পাচ্ছে। কাল সকালে যদি আপনাদেবই থানায গিযে হাতে-পায়ে ধবতে না হয ত ভাগ্য বলে মানবেন।

অকস্মাৎ শেষের কথাটায় আমাদেব সকলেবই মুখ শুকাইয়া উঠিল, লোকটা পুলিসেব স্পাই নযতো? নহিলে এত জোব কিসেব? ইচ্ছামত চাকৃবিই বা পায কেমন কবিয়া। পুলিশেব কথা শুনিবাব পবও বাঙ্গালীব ছেলে হাসিতে পাবে, এত ভবসা কোথা হইতে পায়?

বলা বাহুল্য যে দুই-তিন মুহূর্ত্তেব মধ্যেই আমাদের মনে অনেক কথাই খেলিয়া গেল। আমবা একে একে শুষ্কমুখে বাহিব হইয়া আসিয়া রামবাবুর ঘরে বসিলাম। কিন্তু বহুক্ষণ পর্য্যন্ত কাহাবও বিশেষ কথা কহিবার উৎসাহ রহিল না। আজকালকাব দিনে শিক্ষিত হিন্দু যুবকদেব পুলিশের হাতে দিয়া নাকাল করাইতে এই লোকটির যে বিশেষ বেগ পাইতে হইবে এমনি একটা বিশ্বাস কেমন করিয়া সকলেরই মনে

বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল বলিয়া সকলেই বিষণ্ণ মনে ভাবিতে লাগিলাম যে ইতিমধ্যে আমরা কে কি পরিমাণ ঐ লোকটিকে চটাইয়াছি।

অবশেষে রামবাবুই কথা কহিলেন, কী হবে মশাই ?

সুকুমার কহিল, আসুন আমরা রাতারাতি নিজেরাই জিনিষপত্র নিয়ে কোথাও সরে যাই—

তারিণীবাবু ম্লান হাসিয়া কহিলেন, তা'হলেই কি ওদের হাত থেকে নিস্তার পাবে ভাই, খামকা ওকে আরও চটিয়ে দেবে। এর ভিতর কি আর আমাদের নাড়ীনক্ষত্রের খবর জানতে ওর বাকী আছে ?

সঙ্গে সঙ্গে আমরা আর একদফা শিহরিয়া উঠিলাম। শেষের কথাগুলি বলিবার সময় তাহার কণ্ঠে যে কুটিল বিদ্রূপের সুর বাজিয়াছিল সে কথাও মনে পড়িল। ততক্ষণে আমরা সকলেই ঘামিতে শুরু করিয়াছি।

আরও কয়েক মিনিট চুপ করিয়া থাকিবার পর তারিণীদাই বুদ্ধি দিলেন, বলিলেন, তারচেয়ে এক কাজ করো দিনকতক এমনি চুপচাপ থাক, তারপর আসছে মাস-নাগাদ আস্তে আস্তে একজন একজন ক'রে সরে পড়লেই হবে। যখন তিন চার জন ঠেকবে তখন 'মেস ভেঙ্গে গেল' এই অজুহাত দেখিয়ে একবারে চলে যাওয়া যাবে।

নন্দদা এতক্ষণ কথা কহেন নাই, তিনি এবার দস্তুরমত উত্তেজিত হইয়া কহিলেন, কিন্তু এ যে দস্তুরমত ব্ল্যাকমেল, এ আমরা কিছুতেই সহ্য করব না।

তারিণীদা খিঁচাইয়া বলিলেন, সহ্য না করতে পারো ত থানা-পুলিশ করগে। খাল কেটে কুমীর আনা হয়েছে ঘরে, এখন সহ্য না করলে চল্‌বে কেন ?

ব্ল্যাকমেলের উপব যত বীতবাগই নন্দদার থাকুক, তিনিই পবের দিন প্রথমে রামবাবুকে নোটিশ দিতে আসিলেন, আমার আদালত থেকে বড্ড দূর হয় রামবাবু, আমি মনে করেছি কালকেই বাসা বদল করব।

আমবা সকলে হৈ হৈ করিয়া উঠিলাম। এ লোকটি যে কি পবিমাণ স্বার্থপর তাহা আমবা সকলেই জানিতাম। শুধু জানিতাম না যে এত বড নির্লজ্জ সে! বামবাবু দৃঢস্ববে কহিলেন, অন্ততঃ পনেব দিনেব নোটিশ না দিয়ে আপনাব যাওয়া হতে পাবে না।

নন্দদা মুখখানা গোঁজ করিয়া কহিলেন, তা সে-বকম যদি আপনাবা জেদ কবেন তা'হলে আমি পনেব দিনেব খবচই দেব—কিন্তু থাকায আব আমাব সুবিধে হবে না।

আমাদেবও এই নির্লজ্জতায় জেদ চাপিয়া গেল। আমবা সকলেই কহিলাম, কিন্তু পনেব দিনেব আগে আমবা যেতে দেবোনা। যেতে হ'লে জিনিষ-পত্র বেখে যেতে হবে। তখন বিবাদ বাধিয়া উঠিল। রীতিমত চেঁচামেচি হইতেছে, এমন সময সহসা দ্বাবপ্রান্তে দেখা দিল আসামী স্বযং, সেখান হইতেই হাঁকিয়া কহিল, কেন মিছামিছি মাথা গবম কবছ নন্দা! তোমাব পটলডাঙ্গাব বাসায যাওয়া হবে না।

নন্দদা বিবর্ণ হইয়া উঠিলেন। তিনি যে ইতিমধ্যেই অন্যত্র বাসা ঠিক কবিয়া আসিযাছেন তাহা আমবাও জানিতাম না। সকলে উৎসুক নেত্রে চাহিয়া বহিলাম।

নন্দদা কহিলেন, কেন?

অপূর্ব্ব জবাব দিল, সে বাসায আমি এই মাত্র অন্য লোক দিয়ে এসেছি। সীট্ মোটে একটিই ছিল, তাত আপনি জানেনই।

পরক্ষণেই সে উপরের সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল।

ইহার পর আর নন্দদার বিবাদ করিবার উৎসাহ রহিল না, তিনি অবসন্ন মুখে উপরে চলিয়া গেলেন কিন্তু আহার নিদ্রা সেইদিন হইতেই প্রায় তাঁহার চলিয়া গেল। এধারে আমাদেরও আতঙ্কের অবধি রহিল না, ঠিক সিন্ধুবাদ নাবিকের মতই প্রায় আমাদের অবস্থা, ঐ লোকটিকে বহন কবিবার ক্ষমতা নাই অথচ ঘাড হইতে নামানও প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠিল। ভাবিয়া ভাবিয়া প্রায় যখন পাগল হইবার উপক্রম করিয়াছি তখন সে একটা অভিনব উপায়ে আমাদের স্কন্ধ হইতে নামিয়া গেল।

মনোহরদার একটি অনূঢ়া কন্যা বহুদিন হইতেই পিতাব দুশ্চিন্তার কারণ হইযাছিল, হঠাৎ সেদিন দেশ হইতে সংবাদ পাওয়া গেল সেটির জন্য পাত্র ঠিক হইয়াছে এবং যে-হেতু আগামী শুক্রবারই শ্রাবণ মাসেব শেষ দিন সে-হেতু পত্র পাঠমাত্র মনোহরদা যেন বিবাহের বাজার কবিয়া দেশে চলিয়া আসেন। সম্বন্ধ ঠিক করিয়া সংবাদ পাঠাইয়াছেন মনোহরদার জ্যেষ্ঠ সহোদর, তিনি দেশে থাকিয়া জমি-জায়গা দেখেন, তিনিই বাড়ীর কর্ত্তা।

এই সুসংবাদে মনোহরদা আনন্দে আত্মহাবা হইয়া গেলেন এবং মেসসুদ্ধ লোককে তৎক্ষণাৎ নিমন্ত্রণ কবিয়া বসিলেন, যাইতেই হইবে, কলিকাতা হইতে মাত্র তিন ঘণ্টাব পথ সুতবাং কাহারও কোনো আপত্তি তিনি শুনিবেন না। মনোহরদাকে আমরা শ্রদ্ধা করিতাম, অতএব আমরা সকলেই রাজী হইলাম কিন্তু তখনও জানিতাম না যে মনোহরদা আবেগের মাথায় অপূর্ব্বকেও নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। এমন কি শিয়ালদাতেও কথাটা জানিতে পারি নাই, একেবারে শেষ মুহূর্ত্তে

জানিলাম, স্টেশনে পৌঁছিযাই যখন চোখে পডিল আব একটি কামবা হইতে প্রসন্ন হাস্যে মুখ বঞ্জিত কবিয়া অপূর্ব্ব নামিতেছে।

যাক—তখন আব উপায় কি ? আমবা সকলকেই একটু দ্রুত হাঁটিয়া আগে চলিযা গেলাম এবং মনোহরদার বাহিরেব ঘবে বসিয়া তাস খেলায় মাতিযা উঠিলাম। আমবা বিপদেব প্রথম সিগন্যাল পাইলাম একেবাবে বাত্রি দশটা নাগাদ, যখন মনোহবদা আকুল হইয়া আসিযা কহিলেন, কি হবে ভাই, লগ্নেব আব আবঘণ্টা মোটে সময় আছে, কিন্তু বব ত এল না ?

আমবা সকলেই বিচলিত হইযা উঠিলাম। বব গ্রামান্তব হইতে আসিবে, মোটবেব বাস্তা আছে সুতবাং এত বিলম্বের হেতু কি ? গ্রামেব লোকও তখন বাহিবে জটলা কবিতে শুরু কবিযাছে, গতিক ভাল নয় এ ভাব সবলেবই মুখে চোখে সুস্পষ্ট। আবও ঘণ্টা খানেক পবে নিদারুণ সংবাদ পাওযা গেল, যাত্রার কিছু পূর্ব্বে ববেব ভেদবমি শুরু হইযাছে এবং এখন তাহার বোধকবি অন্তিম মুহূর্ত্ত উপস্থিত।

এই অপ্রত্যাশিত আঘাতে আমবা সকলেই স্তম্ভিত হইযা গেলাম। বাডীতে কান্নাব বোল উঠিল, মনোহবদা'ব দাদা চুল ছিঁডিয়া দাডি ছিঁডিযা পাগলেব মত ছুটাছুটি কবিতে লাগিলেন। আব মনোহবদা, তাঁহাব মুখের দিকে চাওযাই যায না, এমনি শোচনীয় করুণ তাঁহাব অবস্থা।

কিন্তু উপায় কি ? তখন বাবোটা বাজিযা গিয়াছে, আর কয়েক ঘণ্টা মাত্র বাত বাকি। এই সমযেব মধ্যে যেমন করিয়া হউক কন্যাকে পাত্রস্থ কবিতে হইবে নচেৎ তাহার জাত যাইবে। অথচ

সংবাদ লইয়া জানা গেল যে, এ গ্রামে মনোহরদা'র পাল্‌টি ঘরের পাত্র একটিও নাই।

আমাদের মধ্যে অবশ্য পাত্র ছিল, সে সুকুমার। আমি ও তারিণীদা তাহার কাছে কথাটা পড়িতে গেলাম কিন্তু সে স্পষ্টই বলিয়া দিল, সে আমি পারব না। মেয়ের দিকে চেয়ে দেখেছেন সুরেশবাবু?

চাহিয়া আমি সত্যই দেখিয়াছিলাম; যেমন কালো, তেমনি কৃশ, তেমনি শ্রীহীন। তবু কহিলাম, কিন্তু ভদ্রলোকের জাত যায় যে সুকুমার—

সুকুমার জবাব দিল, তা আমি কি করব?

আমরা সকলেই চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। মনে হইল বুঝি ইহার কোন উপায়ই কোথাও দিয়া হইবে না, এমনি শোচনীয় পরি-সমাপ্তির মধ্যেই রাত্রি প্রভাত হইবে। কিন্তু যখন আর প্রভাতের একঘণ্টা মাত্র বাকী আছে তখন সহসা অতর্কিত ভাবেই উপায় হইয়া গেল।

অপূর্ব্বর কথা আমরা ইতিমধ্যে ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। সে-ও একটা আমগাছের নীচে বসিয়া চোখ বুজিয়া এমনভাবে সিগারেট টানিতেছিল যেন এ ব্যাপারের কিছুই তাহার কানে পৌঁছায় নাই। সহসা সে সিগারেটটা ফেলিয়া দিয়া মনোহরদার সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়া ডাকিল, মনোহরদা!

মনোহরদা বিহ্বল দৃষ্টি মেলিয়া চাহিলেন, কি ভাই?

অপূর্ব্বকে এই প্রথম দেখিলাম একটু ইতস্ততঃ করিতে। বার-দুই মাথা চুলকাইয়া কহিল, যদি আপনার আর কোন উপায় না থাকে ত আমাকেই মেয়ে দিন। আমি আপনাদের পাল্‌টী ঘর!

অকস্মাৎ আমাদের সম্মুখে বজ্রপাত হইলেও বোধ হয় এতটা বিস্মিত হইতাম না। মনোহরদাও নির্ব্বাক। শুধু মনোহরদা'র দাদা আসিয়া একেবারে অপূর্ব্বর হাত দু-টা চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন, নেবেন আপনি দয়া করে ?

অপূর্ব্ব জবাব দিল, সে মনোহরদা'র ইচ্ছা।

মনোহরদা প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া কহিলেন, আমার ইচ্ছে-অনিচ্ছে নেই, ভাববারও সময় নেই, তুমি দয়া ক'রে যদি না নাও তাহ'লে কাল সকালে আমায় গলায় দড়ি দিতে হবে।

ভিতরে মেয়েদের মধ্যে আবার গুঞ্জন উঠিল, গ্রামের লোকেরাও আবার ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। অপূর্ব্ব সংক্ষেপে কন্যার পিতার কাছে নিজের পরিচয় দিয়া বাহিরে আসিয়া আমাকেই ডাকিল। কহিল, ভাই সুরেশবাবু তোমাকেই একটা উপকার করতে হবে, তুমি চট্ করে ভোরের ট্রেনে চলে গিয়ে কলকাতাতে একটা ছোট বাড়ী ঠিক করে কিছু জিনিষপত্র কিনে রেডি ক'রে রাখগে, আর যদি পারো ত একটা ঝি—

আমি হাত পাতিয়া কহিলাম, টাকা !

মনোহরদা কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, বরপণের দুশো টাকা দেবার কথা ছিল, সেটা ত মজুত আছে, সেই টাকাই নিয়ে যাও তুমি—

অপূর্ব্ব ঘাড় নাড়িয়া কহিল, ঐটি মাপ করতে হবে মনোহরদা, পণের টাকা আমি নিতে পারব না!...টাকা আমি দিচ্ছি যোগাড় করে—

এই বলিয়া আমাদের উত্তরের অবকাশ মাত্র না দিয়া

সে নন্দদার কাছে গিয়া কহিল, নন্দদা দুশোটি টাকা ধার দিতে হচ্ছে যে!



আ-আমি জা-জানতে চাই, এ-এর মানে কি?

আমরা ততক্ষণে ঘিরিয়া দাঁড়াইযাছি। নন্দদা কহিলেন, টা-টাকা আমি কোথা পাব?

অপূর্ব্ব হাসিল। কহিল, নন্দদার আমার স্মরণশক্তি কম। আজ

সকালেই যে পোষ্ট অফিস থেকে দুশো টাকা তুলেছেন আর সে টাকাটা যে ফতুয়ার পকেটেই আছে, তা কিছুই মনে নেই—

বলিয়া সে অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই বিহ্বল নন্দদার ফতুয়ার পকেট হইতে নোটের গোছা বাহির করিয়া আমার হাতে দিল। তাহার পর কহিল, ভয় নেই, বিয়ের দেনা আমি রাখব না।

নন্দদা এতক্ষণে ভাষা খুঁজিয়া পাইয়াছেন, রাগে তোৎলা হইয়া কহিলেন, আ-আমি জা-জানতে চাই, এ-এর মানে কি ?

অপূর্ব্ব ভিতরে যাইতে যাইতে সংক্ষেপে বলিল, ব্ল্যাকমেল।

পূজার বাজার

ঘটনাটা খুবই ছোট এবং সাধারণ কিন্তু তার ফলটা ছোটও নয়, সাধারণও নয়।

আমাদের ইন্দুর বাবা এক তেলের কোম্পানীর বড়বাবু ছিলেন। কাজেই ছেলের বেশী লেখাপড়া শেখা কোনও দিনই আবশ্যক বিবেচনা করেননি—আর ছেলেকে চাকরীতে ঢোকানোও তাঁর পক্ষে অসম্মানকর বলেই তার বাবা মনে করতেন! সুতরাং অল্প বয়সেই লেখাপড়া ছেড়ে দিবানিদ্রা, আড্ডা দেওয়া ও বিয়ের উমেদারী করা এই নিয়েই ইন্দুর দিনগুলো কাটছিল। এম্‌নি সময়ে, বিয়ের অব্যবহিত পরেই তার বাবা বিনা নোটিশে হঠাৎ একদিন পরলোক যাত্রা করলেন—ছেলের অপরিপক্ক স্কন্ধে হাজার কুড়ি টাকা, একখানা বাড়ী, গুটী ছয়েক ভাইবোন, আর চিররুগ্ন মায়ের ভার দিয়ে।

ইন্দু ব্যবসা করবে স্থির করেছিল। সুতরাং পোল্‌ট্রিতে হাজার দুই,—ডেয়ারীতে হাজার তিন, কাটা কাপড়ের ব্যবসায়ে হাজার-আষ্টেক আর মনোহারী দোকানে হাজার পাঁচেক টাকা লোকসান দিতে তার এক বছরের বেশী সময় লাগল না। এক কথায় সাধারণ বাঙ্গালীর ঘরের অর্দ্ধশিক্ষিত ছেলেদের যে সব ব্যবসায়ের কথা শোনা আছে, তার প্রায় সব গুলিই পরখ করে দেখলে, ব্যাপারটা তত সুবিধের নয়। সুতরাং তখন চাকরী—অনেক ঘুরে, অনেক হেঁটে,—শেষে পৈত্রিক আফিসেই ঢুকেছিল পঁয়ত্রিশ টাকা মাইনেতে। সে আজ বোধ হয় পনেরো বৎসরের কথা।

এ-হেন ইন্দুর উপর দিয়ে সেদিন যে দুর্ঘটনাটা ঘটে গেল সেই কথাই বলছি।

সেপ্টেম্বর মাসের পয়লা। অক্টোবর মাসের মাইনে পাবার আগেই পূজো এসে পড়বে, অতএব পূজোর বাজারটা এমাসের মাইনে থেকেই করা আবশ্যক। ইন্দু অনেক ভেবে চিন্তে, মাইনেটা হস্তগত হওয়া মাত্রই, আপিস থেকে সকাল সকাল অর্থাৎ বেলা দুটোর সময় বেরিয়ে পড়ল, ইচ্ছে দুপুরের দিকে কম-ভীড়ে কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট থেকে কাপড় চোপড় গুলো কিনে ফেলবে।

শ্যামবাজারের ট্রামে চেপে বসল। দুপুর বেলা গাড়ীতে জনপ্রাণী নেই—সেকেণ্ড ক্লাসটা একেবারে খাঁ খাঁ করছে। ইন্দু নিশ্চিন্ত হয়ে জানলার ধারে একটা সিটে বসে পড়ল। কিন্তু লালবাজারের সামনে আসতেই আর একটি আধাবয়সী ভদ্রলোক ট্রামে উঠলেন। গজ গজ ক'রে কি বকছেন শুনে ইন্দু কানটা খাড়া করলে—শুনলে গালাগালির একেবারে যেন মালা গেঁথে চলেছেন,—রাস্কেল, শুয়ার, নন্‌সেন্স, গাধা, স্কাউণ্ড্রেল, পাজী—ইত্যাদি!

ইন্দু আর থাকতে পারলে না, প্রশ্ন করলে,—কি হয়েছে মশাই?

সে ভদ্রলোক বল্‌লেন,—এঁ্যা,—কি বলছেন?

ইন্দু বুঝলে ভদ্রলোক খাটোকথা শোনেন না,—সে একটু হেঁকে বল্‌লে, কি হয়েছে আপনার তাই জিজ্ঞেস করছি, গালাগালি করছিলেন কিনা—

সে ভদ্রলোক নিজের আসন ছেড়ে উঠে এসে ইন্দুর পাশে বসে কানটা এগিয়ে দিয়ে কৈফিয়তের সুরে বললেন, কানে একটু কম শুনি কিনা!



দেবনা গালাগাল,……আজ কিনা বুড়ো বয়সে ট্রামে চাপিয়ে তবে ছাড়লে !

ইন্দু সেটা হাড়ে হাড়েই বুঝতে পেরেছিল,—কি হয়েছে, গালাগাল দিচ্ছিলেন কেন ?

ভদ্রলোক যেন উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন,—বল্‌লেন, দেবনা গালাগাল,

আজ পঁচিশ বছর চাকরী করছি মশায় কখনো ট্রামে চড়তে হয়নি। আজ কিনা বুড়ো বয়সে ট্রামে চাপিয়ে তবে ছাড়লে!

ইন্দু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। ভদ্রলোক বল্‌লেন—পকেটমার মশাই,—গাঁটকাটা! ইন্দুর বুকটা ছ্যাঁৎ ক'রে উঠল। পকেটে হাত দিয়ে দেখলে টাকাগুলো ঠিক আছে। সে ভদ্রলোক বলে যেতে লাগলেন,—গতমাসে মশাই মাইনে পেয়ে বাড়ী গেছি—পৌঁছে দেখি এক পয়সাও নেই—সব নিয়েছে রাস্তায়! কাজেই এ মাসে বাধ্য হয়ে ট্রামে চড়তে হ'ল, হেঁটে আর পকেটকাটার মধ্যে দিয়ে যাবো না।

ততক্ষণে ট্রাম বৌবাজারের মোড়ে এসে পড়েছে। ভদ্রলোক নামবার উদ্যোগ করতে গিয়ে সহসা পাশের লেখাটার দিকে নজর পড়ায় বলে উঠলেন,—এখানেও নিস্তার নেই, ঐ দেখুন না, এরাও লিখেছে, 'পকেটমার হইতে সাবধান'—আচ্ছা মশাই চল্লুম, নমস্কার।

ভদ্রলোক নেমে গেলেন। ইন্দু ভদ্রলোকের কথাটা উপভোগ করতে করতেই কলেজ স্কোয়ার এসে পড়ল। সে তাড়াতাড়ি নেমে পড়ে টাকাগুলো সাবধান করবে বলে যেমন আর একবার পকেটে হাত দিয়েছে দেখলে তা বহু পূর্ব্বেই অন্তর্হিত হয়েছে!

মাথার মধ্যে রাম-রাবণের-যুদ্ধ বেধে গেল। চোখের সামনে ভেসে উঠল—গয়লার ফর্দ্দ, ধোপার ক্রুদ্ধ মুখ, মুদির হিসাব, ছোট ভায়ের কলেজের মাইনে, ছোট বোনের বিয়ের দেনার দরুণ কিস্তি, বড় ছেলের স্কুল, মেজ ছেলের ওষুধ, সেজ ছেলের বিস্কুট, ছোট ছেলের পেনী, এক মেয়ের মোজা, আর এক মেয়ের টনিক, আর মেয়ের শ্বশুর বাড়ীর পূজার তত্ত্ব, রোজকার বাজার, গৃহিণীর কান্না, পূজোর জামা-কাপড়, মোজা, জুতো—আরও যে কত কি তার ঠিকানা নেই। বায়স্কোপের

ছবির মত সবগুলো দ্রুত সরে সরে যেতে লাগল।—একশ' তেত্রিশ টাকা তার এক পয়সাও নেই!

নিজের ওপরই রাগ হ'তে লাগল ভীষণ,—লোকটা নিশ্চয় তার পাশে বসেই টাকাগুলো চুরি করলে, আবার যাবার সময় যেন ঠাট্টা করেই লেখাটা দেখিয়ে দিয়ে গেল; আর সে এমনিই আহাম্মুক—! শুধু আহাম্মুক, গাধা, বাঁদর, ছুঁচো,—নিজেকে গালাগালি দিয়ে অভিধান শেষ ক'রে ফেল্‌লে।

যাই হোক, ভেবে কোনও ফল নেই,—থানায় গিয়ে একটা ডায়েরী করাতেই হবে ব'লে—থানার উদ্দেশ্যে পা হাঁকিয়ে দিলে। ছেলেমানুষীটা বুড়ো বয়সেও ঘোচেনি, সুতরাং থানার কথাটা আগেই মনে পড়ল, তার পরে যে কি হ'বে সে কথা ভেবেও কোনও ফল নেই—আর ভাববারও ক্ষমতাও ছিল না।

দারোগা বাবু প্রাচীনলোক, ঐ কাজ ক'রেই চুল পাকিয়েছেন, দু' পয়সা আছে। সুবিধা দামে একখানি বাড়ী কেনবার চেষ্টায় আছেন। দালাল উপস্থিত হয়েছিল, তার সঙ্গেই দর-দস্তর চলেছে,—

তার মধ্যেই ইন্দুকে প্রশ্ন হ'ল, কি হয়েছে মশাই?

ব'লেই দালালের দিকে চেয়ে বল্লেন,—বাড়ীটা একেবারেই কাজের বার বুঝি, নইলে অত কম দামে বেচছে যে?

দালাল চক্ষু কপালে তুলে বিস্ময় প্রকাশ করলে, তারপর বল্‌লে, কী যে বলেন মশাই? রেস খেলে দেনা, কাবুলীও'লার কাছে দেনা, সে-ত আর ফেলে রাখবার নয়—তাই, এর আগে আর সব বাড়ী গেছে,—এটি ভদ্রাসন।

দারোগা বাবু মনোযোগ দিয়ে সব কথা শুনলেন তারপর হঠাৎ

ইন্দুর দিকে চেয়ে বল্‌লেন,—ডায়েরী করাতে এসে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন কেন ?

ইন্দু অপরাধীর মত তাড়াতাড়ি তখন ঘটনাটা বলতে শুরু করলে—দারোগা বাবু আবারও দালালের দিকে চেয়ে বল্‌লেন,—হ্যাঁ আজ সকালে এক ছোকরা দালাল এসেছিল। একটা গোলমেলে বাড়ী গছাতে চায়, বুঝলেন ? সবে কলেজ ছেড়েছে, চাকরী করবে না, দালালী ক'রে খাবে। তার বিশ্বাস ভয়ানক বুদ্ধিমান, তাই দালালী করবে ব'লে ইতিমধ্যে বিস্তর ট্রাম ভাড়া খরচ করেছে ; কিন্তু বয়েসটা যে কি, —আর কলেজে-পড়া ছেলের দ্বারা যে দালালী হয় না সে কথাটা ভুলেই গেছে। তাই যে কথাটা লুকোতে চায়, মানে বাড়ীর গোলমালটা, সেইটেই আমায় ভয়ানক চালাকী করে বুঝিয়ে দিয়ে গেল।

তারপরেই ইন্দুর দিকে চেয়ে,—হ্যাঁ, কি বল্‌লেন ? পকেট মারা গেছে ? ঐ বাইরে যিনি বসে আছেন ওঁর কাছে গিয়ে লিখিয়ে আসুন। ডায়েরী ক'রে যেতে পাবেন, কিন্তু কিছু ফল হবে না। একটু সাবধান হ'তে পারেন না ?

দালালের দিকে চেয়ে—ক' ফুট বাই ক' ফুট বল্লেন ?

ইন্দু বেরিয়ে এল। হাঁটতে হাঁটতে গোলদীঘিতে এসে পৌঁছল। লোকে লোকারণ্য, সব বেঞ্চিই জোড়া, কেবল একটি বেঞ্চিতে এক বৃদ্ধ বসে হুঁকোয় তামাক খাচ্ছেন, আর কেউ নেই।

ইন্দু সেই বেঞ্চিরই এক প্রান্ত দখল ক'রে বসল ; শূন্য মনে গোলদীঘির জলের দিকে চেয়ে ছিল আর পাশের বৃদ্ধের অবিশ্রাম ভুড়ুক্ ভুড়ুক্ শব্দ শুনছিল। অনেকক্ষণ বাদে হুস্ ক'রে প্রকাণ্ড এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে বল্‌লেন,—বাবাজীর তামাক খাওয়া হয় ?

ইন্দুর চেয়ে বৃদ্ধটি বোধ হয় দশ বার বছরের বেশী বড় হবেন না, তবু এই বাবাজী সম্বোধনে সে একটু হাসলে, তারপর বিনয় ক'রে বল্‌লে,—আজ্ঞে না, খুব ছেলে বেলায় বাবার পকেট থেকে সিগারেট আর চাকরের কানের পাশ থেকে বিড়ি চুরি ক'রে খাওয়ার অভ্যাস হয়েছিল বটে কিন্তু তামাক খাওয়াটা শিখিনি কখনও—

বৃদ্ধটি তখন হুঁকোটা পাশে রেখে প্রশ্ন করলেন, বাবাজীর মুখটি মলিন দেখছি যেন ?

ইন্দু বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ, মনটা ভাল নেই।

বৃদ্ধটি ছাড়বার পাত্র নন, বল্‌লেন, কারণটা ? ইন্দু তখন সব কথাই খুলে বল্‌লে। বৃদ্ধটি সব শুনে একটু কৃপার হাসি হাসলেন, বল্‌লেন,—ঐ ত বাবাজী, তামাক খেতে না শেখার ফলই ঐ! যদি তামাক খেতে শিখতে, তা'হলে চুরিটিও হ'ত না—আর তার জন্য মনও খারাপ হ'ত না। গিন্নির ঝগড়া,—অভাব অনটন, বাইরে অপদস্থ হওয়া ইত্যাদি—সবই সয়েছে বাবাজী এই তামাকের মাহাত্ম্যে। তামাক ধর, বাবাজী—তামাক ধর। ঐজন্যে হুঁকো-কলকে নিয়ে আসি এখানেও, ব্যাটারা আবার তার জন্য কত ঠাট্টা করে! হুঁ—

ভদ্রলোক পকেট থেকে তামাক টিকে বার ক'রে আর এক প্রস্থ সাজবার উপক্রম করতেই ইন্দু বিরক্ত হয়ে উঠে পড়ল। স্থির করলে আর সে কোথাও বসবে না, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে। বাড়ীতে এখন ফেরা—ও বাবা! ভাবতেও তার মাথা ঘোরে!

রাত্রি যখন আটটা তখন সে প্রায় মেছোবাজারের কাছাকাছি এসে পড়েছে হঠাৎ একটা প্রচণ্ড হাস্যরবে চমকে উঠে দেখলে, একটা আধাবয়সী লোক একগাল দাড়ীর ফাঁক দিয়ে মূলোর মত দাঁত বার

ক'বে হাসছে। ইন্দু চাইতেই ব'লে উঠল,—পকেট যে আমাব মতই বাবা, একটা আধলাও নেই, আজ পয়লা তারিখ মাইনে পাওনি ?

ইন্দু তাব স্পর্দ্ধায় বিস্মিত হয়ে হাঁ ক'বে খানিকক্ষণ তাব মুখ পানে চেয়ে বইল—ততক্ষণে লোকটা চলে গেছে।

তখন ইন্দু আবাব হাঁটতে লাগল। হঠাৎ মনে পডল তাব ছেলেবেলাকাব বন্ধু সুবেশ এখন বডলোক হয়েছে, আগে ত খুবই বন্ধুত্ব ছিল। এখন কি আব দুশোটা টাকা দেবে না।

সুরেশ বাডীতেই ছিল। ঘোব কৃষ্ণবর্ণ ছোট মেয়েটিকে (মানে তাব গৃহিণীটি ঘোর কালো) কোলে ক'বে বেবিয়ে এল। আবে ইন্দু যে,—আয় আয়!

ইন্দু বল্‌লে, না ভাই বসবনা, বড দবকাবে তোব কাছে এসে ছিলুম,—দুশোটি টাকা যদি ধার দিতে পাবিস,—আজ একটা বড mis-hap হয়ে গেছে—

সুবেশেব মুখ শুকিয়ে গেল। সে মুহূর্ত্ত কাল ইতস্তত ক'বেই বল্‌লে, দিতে ত পাবতুমই ভাই, তোকে দেব তাব জন্যে ত কিছু নয়, তবে শ্বাশুড়ী ঠাকরুণেব অসুখে প্রায় তিন হাজার টাকা খবচ হয়ে গেল কিনা। হাতে এক পয়সাও নেই। তা তুই দুশো টাকা আফিস থেকে ধার পাবি নি ?

ইন্দু বল্‌লে, তাতো পাবো, কিন্তু আজ রাত্রেই—

সুরেশ বল্‌লে, তা এক কাজ করনা, বৌয়েব একখানা গয়না কোথাও বাঁধা দিয়ে টাকার যোগাড় করনা।

ইন্দু বল্‌লে—দেখি তাই যা হয় করব—

সুরেশ ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে ব'লে উঠল, তুই এখনই যাচ্ছিস না কি? আরে তাই কি হয়, পাগল,—বোস্ বোস্ একটু চা খেয়ে যা,—আরে বোস না—

ইন্দু কিন্তু দাঁড়াল না, চলেই গেল। শেষে ঘুরতে ঘুরতে রাত্রি দশটার সময়ে বাড়ী যাওয়াই স্থির ক'রে বাড়ী গিয়ে পৌছল।

গিন্নি জেগেই ছিলেন, কড়া নাড়তেই দোর খুলে উদ্বিগ্নভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, ব্যাপার কি গো?

ইন্দু শুষ্ক কণ্ঠে বললে, কিছু না এমনিই—ব'লে ঘরে গিয়ে বসল।

গিন্নি আরও শঙ্কিত হয়ে উঠলেন, বললেন, কাপড়-চোপড় কিনে নিয়ে আসবার কথা—তাই বা কোথায়? এত রাতই বা কেন! আমি ত ভেবেই মরি।

ইন্দু বল্লে, হুঁ—

হুঁ কি গো? যাই হোক, এখন দুটো টাকা দাও দেখি, খাবার আনতে দিই—ভাবতে ভাবতে আর রান্না হয়নি—

ইন্দু ব্যাপারটা বুঝতে পারলে। তার বুক আরও শুকিয়ে উঠল—বল্লে, টাকা নেই।

টাকা নেই কি গো?

ভাই বোন ছেলে মেয়ে সব এসে জড় হ'ল। তার পর ইন্দু কথাটা পাড়তে না পাড়তেই তার অবর্ণনীয় লাঞ্ছনা শুরু হ'ল। অবশেষে গিন্নী কাঁদতে কাঁদতে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন,—বুড়ো মিন্সে, স্বচ্ছন্দে কিনা টাকা গুলো ধরে দিয়ে এল এক বেটা চোরকে, আমি কিচ্ছু জানিনা, কালই আমায় বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও, আমি যে এখন গয়না খুলে দেব বাঁধা দেবার জন্যে, তা পারব না—

ইন্দুব মনে পড়ল এই বাসন্তীই বিয়ের পর একদিন তাকে বলেছিল গয়নায় আমার দরকার কি ?

ছোট ভাই বল্‌লে, যেখান থেকে পার এখন টাকা নিয়ে এস, ঐ কাণ্ড ক'রে শুধু হাতে ফিরতে লজ্জা হ'লনা ?

ইন্দু দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে উঠল, টাকার যোগাড় ত করতেই হবে।

রাত তখন এগারটা বেজে গিয়েছে, শোবার উদ্যোগ করছি এমন সময় দরজায় ঘা পড়ল—গণেশ বাড়ী আছিস ?

চেয়ে দেখি ইন্দু। গিন্নিকে বল্লুম—এত রাত্রে যখন এসেছে হয়ত টাকা কড়ি ধার চাইতে পাবে, সাড়া-শব্দ দিওনা যেন, তোমার অসুখ করেছে বলে কাটিয়ে দি।

তাব পব নেমে গিয়ে বন্ধুকে অভ্যর্থনা কবলুম।

রাস্তা খরচ

আর সবই সে চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছে। চাকুরীর জন্য পথে-পথে ঘোরা, আফিসে আফিসে ধর্ণা দেওয়া, বড়বাবুদের বাড়ী যাওয়া, সবই সে শেষ করিয়াছে। মায়ের একখানি গহনা বেচিয়া চায়ের দোকান করিয়াছিল, কিন্তু চায়ের দোকানের দেনা শোধ করিবার মত বদ-অভ্যাস আমাদের দেশে নাই বলিয়া, কিছু দেনা লইয়া ঘরে আসিয়া বসিল। চুয়াডাঙ্গা হইতে গুড় এবং যশোর হইতে কাঁঠাল কলিকাতায় চালান দেওয়ার চেষ্টাও দিন কতক করিয়াছিল কিন্তু তাহাতে শুধু মায়ের আর একখানি গহনাই গেল, টাকা ঘরে আসিল না।

বন্ধু জগদীশের অবস্থা মন্দ নয়; শ্বশুর সিনিয়র উকীল, তিনি জামাতার পকেট-খরচা চালানোর মত ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই করিয়া দিয়াছেন, বছর-দুইয়ের মধ্যেই ভাল প্র্যাকটিশ দাঁড়াইবে এ ভরসাও দিয়াছেন। জগদীশ একদিন ঠাট্টা করিয়া কহিল,—তাই ত অজয়, কিছুই ত বাদ দিলি নে, বাকী আছে শুধু বীরেন চাটুয্যের মোটরের নীচে পড়া, তাই না হয় চেষ্টা করে দেখ।

বীরেন চাটুয্যে বা স্যার বীরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জ্জির পরিচয় নিশ্চয়ই আপনাদের দিতে হইবে না। কলিকাতার সর্ব্বাপেক্ষা ধনী বণিকটির নাম, ঈর্ষ্যার সহিত, প্রায় প্রত্যেকেরই অর্থাভাবের সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে।

অজয় তাচ্ছিল্যের সহিত কহিল,—হ্যাঁ—ও সব আর চলে না; নেহাৎই মামুলি হয়ে গেছে।

কিন্তু বাড়ী আসিতে আসিতে অজয়েব মনে হইল—স্যাব চ্যাটার্জ্জিব ত শোনা যায় অনেক টাকা, সত্যই ত। কিছু যদি তিনি দেন ত তাঁব পক্ষে কীই বা ক্ষতি? কিন্তু অজয়েব সেই সামান্য টাকাতেই কত উপকাব হইতে পাবে। ব্যাপাবটা ভাবিতে ভাবিতে দস্তুরমত মাথা গরম হইয়া উঠিল।

সাবা বাত্রি বেচাবাব ঘুম হইল না, মনে হইল যতক্ষণ না বীবেন চ্যাটুয্যের কিছু টাকা নিজেব পকেটে আসিতেছে ততক্ষণ আব কিছুতেই শান্তি নাই। কিন্তু কি উপায়ে? মোটবেব নীচে চাপা পডাব চেষ্টা অনেকেই কবিযাছে—সুতবাং উহাতে আব কিছু সুবিধা হইবাব সম্ভাবনা নাই। বড জোব একটা কুডি টাকাব চাকুরী কিম্বা শ'খানেক টাকা নগদ। একটা বড কিছু কবিতে হইবে। অনেক ভাবিযা শেষে ভোব বাত্রে মাথায় একটা মতলব গেল।

তখন বাত্রি চাবটা—এত সকালে কাহারও সহিত দেখা কবা সম্ভব নয়, কিন্তু বিছানায় পডিয়া থাকা আবও অসম্ভব। সে উঠিযাই পডিল এবং ঘণ্টা দেডেক সময় কোনও বকমে পায়চাবী কবিযা কাটাইয়া ছয়টাব আগেই জগদীশেব কাছে পৌছিল।

জগদীশেব সাতটাব আগে ঘুম ভাঙ্গে না সে জানিত। তাই সে সোজা গিয়া তাহাব চাকবকে কহিল,—বাবুকে বল আমাব বাডীতে বড বিপদ, জরুবী দরকাব—এক্ষুণি একবাব নীচে আসতে হবে।

সসব্যস্তে চোখ মুছিতে মুছিতে জগদীশ কোন রকমে কাছা দিতে দিতে নামিয়া আসিল।—কি ব্যাপার বে?

—ওহে, কোথায় তোমাব বাড়ীর পাশে একটা ঝরঝবে মোটর

গাড়ী একশ' টাকায় বিক্রী আছে বলেছিলে—সেইটে ঠিক ক'রে দিতে হবে, আমি কিনব।

জগদীশ কিছুক্ষণ বিহ্বল ভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, তার মানে?

অসহিষ্ণুভাবে অজয় কহিল, মানে আবার কি? গাড়ীটা আমি কিন্‌ব। কোনও রকমে কয়েকটা দিন চল্‌বে ত?

জগদীশ তবুও চাহিয়া রহিল,—তোর কি ভাবনায় মাথা খারাপ হয়ে গেল? আর এই জন্যে আমায় 'বাড়ীতে বিপদ হয়েছে' ব'লে টেনে তুল্‌লি?

বিরক্ত হইয়া অজয় কহিল,—দেখ তোর মাথাটা বড্ড মোটা। ওকালতিতে কোনও দিন তোর কিছু হবেনা—যতই না কেন তোর শ্বশুর পুশিং দিক্‌।

জগদীশের ঘুম ছাড়িয়াছে ততক্ষণে। সে কহিল,—কী মতলব খুলে বল্‌ দেখি।

অজয় জগদীশের কানের কাছে মুখটা নামাইয়া 'মতলব' খুলিয়া বলিল। জগদীশের মুখ শুনিতে শুনিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—সে কহিল, মাইরি—দেখ্‌ চেষ্টা ক'রে যদি লাগাতে পারিস্‌। মোটর কিন্‌তেই বা যাবি কেন, আমি দিন চারেকের জন্য চেয়ে নেব এখন। গোটা দশেক টাকা খরচ করলেই একটা মিস্ত্রিকে দিয়ে গাড়ীটা রং করিয়ে নিতে পারবি—

তখনই জগদীশ অজয়কে লইয়া বাহির হইয়া গেল। মোটর ঠিক করিয়া, মিস্ত্রিকে রং করার জন্য দুইটি টাকা বায়না দিয়া দু'জনে যখন ফিরিল তখন জগদীশের আদালতে যাইবার সময় হইয়াছে;

অজয়ও বাড়ী ফিরিয়া আহারাদির পর নিশ্চিন্ত হইযা ঘুমাইযা পড়িল।...

মিস্ত্রির সঙ্গে কথা ছিল যে সে এক দিনেই রং করিয়া দিবে। যদিচ তাহার কথার উপর অজয বিশেষ আস্থা স্থাপন করে নাই তথাপি যখন শুনিল যে সে রাত্রি জাগিয়া রং-এর কাজ শেষ করিযাছে তখন সে ব্যাপারটাকে শুভলক্ষণ বলিয়াই ধরিযা লইল। পরদিন ত্রযোদশী সুতবাং সেই দিনই শুভ কার্য্যে যাত্রা করিবে স্থির করিল।

স্যার বীরেন চ্যাটার্জ্জিব একমাত্র পৌত্র সুধাংশু তাহাব নিজস্ব বেবি-রোল্‌স্‌'খানি লইযা ঢাকুরিযাব দিক হইতে লেক্‌ হইযা বাডী ফিরিতেছিল। অন্য দিন এমন সময় সে বাড়ী ফিরিয়া যায়, আজ সন্ধ্যা ঘনাইযা আসিয়াছে, হয় ত এতক্ষণ দাদু তাহাব খোঁজে লোক পাঠাইতে শুরু করিয়াছেন ভাবিয়া গাডী সে একটু জোবেই চালাইতে-ছিল, কিন্তু অন্যমনস্ক ছিল বলিয়াই হউক আর যে কারণেই হউক ইউনিভার্সিটি রোয়িং ক্লাবের কাছে মোড় ফিরিতেই সশব্দে ধাক্কা লাগিল একখানি পুরাতন মডেলের ওভারল্যাণ্ডের সঙ্গে—ইস্‌!

সুধাংশুর গাড়ীর যে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল তাহা নয় কিন্তু ওভারল্যাণ্ড গাড়ীখানার সম্মুখের অনেকখানিই উডিয়া গিয়াছিল। গাড়ীটা পাশে বেড়ার গায়ে গিয়া আট্‌কাইয়া থামিয়া গিয়াছিল, সুধাংশু তাড়াতাড়ি গাডী থামাইয়া নামিয়া পড়িয়া কহিল, ইস্‌—আপনার গাড়ীটাব ত বড্ড ক্ষতি হ'ল!

অজয়ও ততক্ষণ গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িয়াছে; সে মিষ্ট হাসিয়া কহিল, কিন্তু দোষ আমারই। আমারই হর্ণ দেওয়া উচিত ছিল।



কিন্তু দোষ আমারই। আমারই হর্ণ দেওয়া উচিত ছিল।

সুধাংশুর বয়স সতেরো, চেহারা সুন্দর। হাসিতে সে-ও জানে। সে আরও মিষ্ট হাসিয়া কহিল, কিন্তু আমিও যে জোরে চালাচ্ছিলুম তাতে আর সন্দেহ নেই। তা'ছাড়া হর্ণ দেওয়া আমারও উচিত ছিল। কিন্তু ওটার কি কিছুই করা যাবে না?

সে হেঁট হইয়া ইঞ্জিনটা নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া আদ্যোপান্ত গাড়ী-

টাবদিকে বাব-কতক চোখ বুলাইযা সোজা হইযা কহিল, নাঃ, ওটাব আব কিছুই কবা যাবে না !

সুধাংশুব তীক্ষ্ণদৃষ্টি তাহাব মুখেব উপব বহিযাছে অনুভব কবিযা অজয কেমন যেন অস্বস্তি অনুভব কবিতেছিল। সে চোখ নামাইযা কহিল, কি আব হবে। দেখি এখান থেকে একটা এ-এ-বি'কে ফোন ক'বে দিযে বাস-এ বাড়ী চলে যাই।

সুধাংশু কহিল, আপনার বাড়ী কোথায ?

অজয কহিল, আলিপুবে।

সুধাংশু কহিল, আলিপুবে ত আমাদেবও বাড়ী, চলুন না আমি আপনাকে পৌছে দিচ্ছি।

অজয বাব কতক 'না, না' 'সে কি কথা' কবিযা সুধাংশু পাশে উঠিযা বসিল। সুধাংশু কহিল, ফোন কববেন ?

অজয জবাব দিল, ফোন কবলে ত ভালই হ'ত।

একটা পাব্লিক ফোনেব সামনে গাড়ী বাখিযা সুধাংশু কহিল, যান্—ক'বে আসুন, আমি বসছি।

অজয জগদীশেব পাশেব বাড়ীব ডাক্তাববাবুকে বলিযা জগদীশকে মোটবটিব খবব দিল, তাবপব ফিবিযা আসিযা সুধাংশুব পাশে বসিল।

গাড়ী চালাইতে চালাইতে কহিল, আপনাব বাড়ীটা কোন বাস্তায ?

স্যর চ্যাটার্জ্জিব বাড়ী যে বাস্তায, তাহাবই কাছাকাছি একটা বাস্তাব নাম করিল।

সুধাংশু কহিল, আরে ! আমাদের বাড়ীও যে ঐ পাড়ায়।

অজয় সাগ্রহে কহিল, তাই নাকি? কোথায়?

সুধাংশু রাস্তা ও নম্বর বলিতে অজয় আশ্চর্য্য হইয়া কহিল—আপনি কি তা হ'লে—

সুধাংশু কহিল, হ্যাঁ স্যর চ্যাটার্জ্জি আমার দাদু। কিন্তু আপনি আমায় চিনতেন না বুঝি?

অজয় কহিল, না। কি ক'রে চিনব বলুন!…ওঁকে চিনি। সভা সমিতিতে দেখেছি।

অজয় মনে মনে ভাবিতেছিল যে কি করিয়া মিথ্যা কথা বলিতে হয় সেই সম্বন্ধে সে একখানা বই লিখিবে।

সুধাংশু খানিক পরে কহিল, আপনার কি এখন খুব কাজ আছে?

অজয় কহিল, ন্-না। কাজ আর কি?

—তা হ'লে একটু নেমে যান না আমাদের বাড়ী। একটু চা খেয়ে যাবেন আর অমনি দাদুর সঙ্গে একটু আলাপও হবে—

অজয় মনে মনে কহিল, ভগবান! এতদিনে কি মুখ তুলে চাইলে?

মুখে কহিল,—বেশ ত! সে-ত আমার সৌভাগ্য।

ততক্ষণে স্যর চ্যাটার্জ্জির বিরাট প্রাসাদের সম্মুখে গাড়ী থামিয়াছে। অজয় সুধাংশুর পিছনে পিছনে আশা-পুলক-কম্পিত-বক্ষে সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া ড্রয়িংরুমের মধ্যে প্রবেশ করিল। চতুর্দ্দিকের অসংখ্য দর্পণে নিজের চেহারা দেখিয়া তাহার যেন লজ্জা বোধ করিতে লাগিল; যদিও জগদীশের দেশী কাপড় এবং নিজেরই খুব পুরাতন নয় এমন একটা গরদের জামা পরিয়া আসিয়াছিল, তথাপি ঘরের আসবাব-পত্রের ঐশ্বর্য্য যেন তাহাকে বার বার ধিক্কার দিতে লাগিল।

একটু পরেই প্রবেশ করিলেন স্যর চ্যাটার্জ্জি ও সুধাংশু। সে কোনও বকমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া অত্যন্ত অপ্রস্তুতভাবে তাড়াতাড়ি একটা নমস্কাব সাবিয়া লইল।

স্যব চ্যাটার্জ্জি বলিলেন, ব'স বাবা ব'স। সুধা বুঝি দিয়েছে তোমাব গাড়ীখানি শেষ করে?

অজয় হাসিয়া কহিল, এরই মধ্যে আপনার কানে গেল? ··কিন্তু সে দোষ আমারই। আমিই আনাড়ির মত গাড়ী চালাচ্ছিলুম।

তাবপব দ্রুত আলাপ জমিয়া উঠিল। স্যার চ্যাটার্জ্জি এ-কথা সে-কথাব পব প্রশ্ন করিলেন, কি করো বাবা তুমি?

একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিযা অজয় কহিল, করি না বিশেষ কিছুই। মধ্যে দিন-কতক শেযাব মার্কেটে ঘুবেছিলুম—তা বিশেষ সুবিধে হ'ল না।···একটা বড় বিজ্‌নেস-এ ঢুকতে পারতুম ত হ'ত। ববাবব ঐ দিকেই ঝোঁক রয়েছে কি-না!

—কি ভাবে বিজনেস্‌-এ ঢুকতে চাও তুমি?

—এই ধরুন, কন্‌ফিডেন্সিয়াল্‌ এজেণ্ট বা ট্রাভ্‌লিং অর্গানাইজার—এমনিই একটা কিছু। অবিশ্যি অন্য ভাবেও—

এই সময় চা আসিল, তাহার সঙ্গে প্রচুর জলখাবার। আহাবাদি আপ্যাযনে রাত্রি প্রায় সাড়ে নযটা বাজিল। অজয় কহিল, আচ্ছা আজ তবে আসি স্যর চ্যাটার্জ্জি!···আপনার সঙ্গে কোনও দিন মুখোমুখি আলাপের সৌভাগ্য হবে তা স্বপ্নেও ভাবি নি।

স্যর চ্যাটার্জ্জি কহিলেন, বাইরে থেকে যতটা মনে করো বাবা আমি ততটা বড় নই। যাই হোক্‌ কাল দুপুরের দিকে যদি সময় ক'রে আমার অফিসে যেতে পার ত কাজকর্ম্মেব কথা একটু আলোচনা করতে পারি।

—নিশ্চয়ই যাব, ঠিক বারোটায় আমি যাব আপনার কাছে।

ইহাকেই বলে মেঘ না চাহিতে জল। অত্যন্ত লঘু মন লইয়া অজয় বাহিরে আসিল। একটু ভয় ছিল, সুধাংশু পাছে পৌঁছাইয়া দিবার প্রস্তাব করে—তাহা হইলে ঠিকানার গোলমাল ধরা পড়িত। যাহা হউক, সে দিক দিয়া সে যায় নাই—এই ভাল।

মনের আনন্দে একবার ভাবিল একটা ট্যাক্সি লইবে—কিন্তু নেহাৎ অনেকগুলি টাকা খরচ বলিয়া অতি কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া গুটি-গুটি বাস-এ গিয়া বসিল। সোজা জগদীশের বাড়ী যাইতে হইবে।

জগদীশের বাড়ী পৌঁছিল রাত তখন এগারটা প্রায়। জগদীশ তবুও জাগিয়া বসিয়াছিল। সাগ্রহে কহিল, যাক্ তবু এলি। আমি ত হতাশ হয়ে পড়ছিলুম।···তার পর, কি হ'ল—বল্ সব।

অজয় সব কথা খুলিয়া বলিল, জগদীশ শুনিয়া লাফাইয়া উঠিল—বলিস্ কি, কেল্লা মার দিয়া বল্। এত নির্ব্বিবাদে যে কাজ হাসিল হবে তা ভাবি নি।···কিন্তু মাইরি, তুই ব'লেই চাল বজায় রেখে তার সঙ্গে কথা কয়ে আসতে পারলি, আমি ত ভাই পারতুম না।

অজয় বিজ্ঞ ভাবে কহিল, ও সব একটা আর্ট, বুঝলি? কালচার করতে হয়। একদিনে হয় না।

জগদীশ কহিল, কিন্তু এত বড় বিজনেস্ চালাচ্ছে কি বুদ্ধি নিয়ে বল্ দিকিনি? সহজে বোকা বনে গেল?

অজয় ললাটে আঙ্গুল ঠেকাইয়া কহিল,—কপাল দাদা, কপাল!

পরদিন সাজসজ্জা ও পরামর্শের মধ্য দিয়া সকালটা অল্পেই কাটিয়া গেল, মধ্যাহ্নের আগেই অজয় পৌঁছিল অফিসে। বিরাট অফিস—বিপুল

জনতা—সেই সমারোহের মধ্যে তাহাকে কেহ আমলেই আনিতে চাহে না। বিশেষ করিয়া 'বড়াসাহেব'-এর ঘরে তাহার কার্ড লইয়া যাইতে সব চাপরাশীই অস্বীকার করে। বহু কাকুতি মিনতিতে একটি বৃদ্ধ আরদালী কার্ড লইয়া ভিতরে গেল এবং অল্প পরেই ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, বসিতে হইবে।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে তাহার ডাক পড়িল। সে দুর্গা নাম স্মরণ করিয়া বড় সাহেবের কামরায় প্রবেশ করিল।

স্যর চ্যাটার্জ্জী কহিলেন, এস বাবা, ব'স।

অজয় ঘটা করিয়া নমস্কার সারিল,—তারপর একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া বার-বার অনুভব করিতে লাগিল যে তাহাকে যথেষ্ট স্মার্ট দেখাইতেছে না।

স্যর চ্যাটার্জ্জী কহিলেন, দেখ, তুমি আমার অপরিচিত; তোমার বয়স অল্প; তার ওপর ব্যবসায়ে তুমি কাঁচা। টপ্ ক'রে তোমায় দায়িত্বপূর্ণ কাজ ত দিতে পারি না।·····আগে দু-একটা ছোট খাট কাজ দিয়ে দেখ্‌তে চাই তুমি কি রকম কাজের লোক।······ কি বলো?

অজয় সাগ্রহে কহিল,—বেশ ত? সে ত ভাল কথাই।

স্যর চ্যাটার্জ্জী তখন একখানা 'সিল্ করা' খাম পকেট হইতে বাহির করিয়া কহিলেন—তাহ'লে আজই একবার দিল্লী যাও। সেখানে শ্যামলাল রায় উকিল—এই চিঠিতেই ঠিকানা আছে—তাঁর সঙ্গে দেখা করবে। তাঁর সামনে বসে খাম খুলে দেখ্‌বে এর মধ্যে দুখানা চিঠি লেখা আছে—একখানা তোমার আর একখানা শ্যামবাবুর। তাইতেই সব ইন্‌স্ট্রাক্‌সন্‌স্ পাবে। খুব কন্‌ফিডেন্সিয়াল কায, মনে থাকে যেন। দুজনে পরামর্শ ক'র।······কেমন, পারবে ত?

আনন্দে তখন অজয়ের প্রায় কণ্ঠরোধ হইতেছিল, সে শুধু কহিল,—নিশ্চয় পারব।

—আচ্ছা, এখন এ'স তাহ'লে, গুছিয়ে টুছিয়ে নাও। আমারও একটু কাজ আছে, অত্যন্ত ব্যস্ত।

অজয় চিঠিখানি পকেটে ফেলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। অফিস হইতে বাহির হইয়া তাহার মনে পড়িল,—স্যর চ্যাটার্জ্জী খরচ পত্রের কথা কিছু বলিলেন না ত! একবার মনে হইল ফিরিয়া যায়, আবার যেন লজ্জা বোধ হইতে লাগিল। সে ইতস্তত করিতে করিতে আদালতে পৌছিয়া গেল। জগদীশের কাছে গিয়া সব খুলিয়া বলিল।

জগদীশ বলিল, ত্যাখ্ সামান্য টাকার জন্য আর নতুন ক'রে যায় না। ওতে মন বড় ছোট হয়ে যায়, আমি বরং গোটা কুড়ি টাকা দিচ্ছি আর গোটা দশেক টাকা বাড়ী থেকে নিয়ে তুই রওনা হয়ে যা—যদি দেখিস যে এমন কাজ করতে হবে যা'তে টাকাকড়ি বেশী লাগে তখন না হয় ওঁকে টেলিগ্রাম করিস্।

অজয়েরও সেই কথা মনে লাগিল। সে কুড়িটি টাকা ও একটি স্যুটকেশ জগদীশের বাড়ী হইতে লইয়া বাড়ী ফিরিল এবং তাড়াতাড়ি কোনও মতে স্নান সারিয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয় দু'একটা জিনিষ স্যুটকেশে ভরিয়া লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। মাকে খুব সাবধানে থাকিতে বলিয়া এবং নিজে খুব সাবধানে থাকিবে প্রতিশ্রুতি দিয়া যখন বাহির হইল তখন দিল্লী এক্সপ্রেসের আর মাত্র পঁচিশটি মিনিট বাকী। অগত্যা একখানা ট্যাক্সীই করিতে হইল। একটি টাকা বাজে খরচ হইল বটে কিন্তু গাড়ী ধরাও'ত চাই?

পরদিন সন্ধ্যায় দিল্লী পৌছিল যখন, তখন দেহের অবস্থা খুবই

খারাপ। কিন্তু তবুও হোটেলে পৌছিয়া স্নান সারিয়া সামান্য একটু জলযোগেব পবই বাহির হইল উকিল বাবুব খোঁজে। নূতন জায়গা —অনেক কষ্টে বাড়ীর ঠিকানা খুঁজিয়া বাহির হইল যদিবা, উকিল বাবু বেঙ্গলী ক্লাবে গিয়াছেন শোনা গেল ।···আবার খুঁজিতে খুঁজিতে বেঙ্গলী ক্লাব, এবাব শ্যামবাবুব দেখা মিলিল। শুনা গেল শ্যামবাবু এখানে স্তব চ্যাটার্জ্জীর ল-এজেণ্ট, একটি মক্কেলেব দৌলতেই অনেক পয়সা।

শ্যামবাবু বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন, কোথা থেকে আসছেন বল্লেন ?

—সাব চ্যাটার্জ্জীব কাছ থেকে। জরুবী চিঠি আছে। আমি একটা কন্‌ফিডেন্সিয়াল্‌ কাজে এসেছি—সেই সব ইন্‌ষ্ট্রাক্‌সান্‌স্‌ আছে।

সময়-বিশেষে অজয় অসাধারণ মুরুব্বিযানা দেখাইতে পাবিত। স্তবাং শ্যামবাবু বিশেষ বিচলিত হইযা কহিলেন, কাল সকালে যদি দয়া ক'বে আমাব বাসায় আসেন, তা'হলেই স্থবিধা হয। আজ এত বাত্রে খুব জরুবী হলেও কিছু কবা যাবে না ত। আমি ববং গাড়ী পাঠিয়ে দেব আপনাব হোটেলে , কোন্‌ হোটেলে আছেন বল্লেন ?

হোটেলেব নাম ঠিকানা দিয়া সে নিশ্চিন্তভাবে একটা টাঙ্গা কবিয়া হোটেলে ফিবিল এবং আহাবাদি কবিয়া অবিলম্বে শুইয়া পড়িল। রাত্রে স্বপ্ন দেখিল সে যেন একটা বিরাট বোল্‌স্‌-এ চড়িয়া স্বর্গে বেডাইতে গিয়াছে। দেবরাজ একবেলা থাকিয়া যাইবার জন্য সাধাসাধি করিতেছেন। কিন্তু সে কিছুতেই বাজী হইতেছে না।

পবদিন সকালে উঠিয়াই দাডী কামানো, স্নান করা প্রভৃতি সাবিয়া লইল। তাহাব পর জলযোগ শেষ কবিয়া প্রস্তুত হইয়া বসিয়া কাগজ

পড়িতে লাগিল ; ঠিক সাড়ে সাতটার সময় শ্যামবাবুর গাড়ীটি হোটেলের দ্বারে আসিয়া থামিল। আবার সেই দুর্গা-স্মরণ, আবার দুরু-দুরু-বক্ষে যাত্রা।

শ্যামবাবুর অফিসে, তখনই বহুলোক জমিয়াছে। কিন্তু অজয়কে দেখিয়া তিনি উহাকে খাস্ কামরায় ডাকিয়া লইয়া গেলেন। কহিলেন, চিঠি এনেছেন ?

হাঁ, এই যে !

খামখানি পকেট হইতে বাহির করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। মধ্যে দু-খানি চিঠিই আছে। নিজের নামের চিঠিখানির প্রথম লাইন পড়িয়াই সহসা অজয়ের মাথাটা যেন ঘুরিয়া উঠিল, তাহাতে লেখা ছিল ;—

অজয় বাবু,

এইবার নিয়ে প্রায় চল্লিশবার হ'ল। যা'রা নিতান্ত মামুলীভাবে দাদুর সঙ্গে পরিচয় করতে চেয়েছে তারা আমার গাড়ীর নীচে চাপা পড়েছে—সে প্রায় জন-কুড়ি। তা-ছাড়া ছেলেবেলায় আমায় চুরি করাব চেষ্টা হয়েছে বার দুই-তিন। নদীতে স্নান করবার সময় ডুবিয়ে দিয়ে উদ্ধার করার চেষ্টা সে'ও অমনি হ'বে। দার্জ্জিলিঙে, এখানে, সিমলাতে ডাকাত সেজে এক দল লোক আক্রমণ করেছে আর বাবুর উদ্ধার করার চেষ্টা করেছেন সে-ও ঢের। কিন্তু আপনার চেষ্টাটা কিছু অভিনব।······যাই হ'ক আমায় ফাঁকি দিতে পারেন নি। গাড়ী দেখেই বুঝেছি, ঝর-ঝরে ভাঙ্গা গাড়ী, খুব তাড়াতাড়ি রং করা হয়েছে। আপনার নম্বর নিয়ে খোঁজ ক'রে জেনেছি তা'ও গাড়ী আপনার নয়। আপনার নামে গাড়ী চালাবার লাইসেন্সও নেই। যে ঠিকানা আপনি

দিয়েছিলেন সেখানে আপনার নামে কেউ থাকে না, সুতরাং উদ্দেশ্য বুঝতে আমার বাকী ছিল না। অন্য লোক হ'লে দাদু দরোয়ান দিয়ে তাড়িয়ে দিতেন, আপনার বেলায় আমিই মজা করব ব'লে তাকে ব'লে ক'য়ে এই ছলনাটুকুতে রাজি করিয়েছি।

আশা করি ভাল আছেন। বুদ্ধির অহঙ্কার আর করবেন না, নমস্কার! ইতি—

আপনার 'সুধা'।

সঙ্গের চিঠিটি স্যর চ্যাটার্জ্জীরই লেখা, শ্যামবাবুকে লিখিয়াছেন—প্রিয় শ্যামবাবু, পত্রবাহক ভদ্রলোককে কলিকাতা ফিবিয়া আসার রাস্তা খরচ যা লাগে দিয়া দিবেন, আমি আপনাকে পরে সে টাকা পাঠাইব।

নীচে দস্তুরমত স্বাক্ষর।

শ্যামবাবু কহিলেন, ওকি আপনার মুখ অত শুকিয়ে উঠল কেন?

মুহূর্ত্ত মাত্র অজয় চক্ষু বুজিয়া ব্যাপারটা বুঝিয়া লইল; তারপব জাগিয়া কহিল, না তা' নয়। তবে অনেক দূর ঘুরতে হ'বে এই গরমে, তাই! এই নিন্ আপনার চিঠি।

শ্যামবাবু চিঠিখানি বার-দুই পড়িয়া একটু বিরক্ত ভাবে চাহিলেন। এ-কি জরুরী চিঠি! তারপর স্বাক্ষরটা আরও ভাল করিয়া দেখিয়া কহিলেন, আপনার তাহ'লে কত খরচ পড়বে?

অজয় চিন্তাক্লিষ্ট ভাবে কহিল, তাই-ত বলা মুস্কিল। আমায় বলেছেন এখান থেকে লাহোর যেতে, লাহোর থেকে পেশোয়ার, পেশোয়ার থেকে করাচী, করাচী থেকে রাজপুতানার মধ্য দিয়ে আমেদাবাদ, ওখান থেকে হায়দ্রাবাদ, হায়দ্রাবাদ থেকে মাদ্রাজ,

মাদ্রাজ থেকে ওয়ালটেয়ার পুরী হ'য়ে কলকাতা······টাইমটেবল্ আছে আপনার কাছে ?

শ্যামবাবু টাইমটেবল্ বাহির করিয়া দিলেন। অজয় বহুক্ষণ ধরিয়া হিসাব করিয়া কহিল, সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ীভাড়া আর অন্য খরচা মিলিয়ে প্রায় ন'শ টাকা পড়বে।

শ্যামবাবু লোহার সিন্দুক খুলিয়া একশত টাকার নয় খানি নোট গুণিয়া দিলেন ও স্যর চ্যাটার্জ্জীর চিঠির পিছনেই একটি রসিদ লিখাইয়া লইলেন।

অজয় সেইদিনই তুফান মেলে চড়িয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল। জগদীশের সঙ্গে দেখা করিয়া কহিল, বেচারার গাড়ীটা ভেঙ্গেই গিছল ওর দামটা দিয়ে দে, আর দেখ, তোর ব্যাঙ্কে আমার নামে একটা কারেণ্ট একাউণ্ট খুলে দে।

শ্যামবাবুর পত্রে রাস্তা খরচের হিসাব পাইয়া স্যর চ্যাটার্জ্জীর মুখ কিন্তু লাল হইয়া উঠিল।

* বিদেশী গল্পের আভাস আছে।

হাসির গান

সেবার যে কেন আমরা সতীশের নয়াদিল্লীর বাসা হইতে অমন অকস্মাৎ চলিয়া আসিয়াছিলাম এবং কেন যে আমরা আর কখনও দিল্লী যাই নাই, সে কথাটা আজও কেহ জানে না। কাহাকেও বলি নাই এবং নিজেরা আপোষেও সেকথাটা কখন আলোচনা করিনা।

বাহির হইয়াছিলাম দেশভ্রমণে। সতীশ যখন এখানকার অফিস হইতে দিল্লীতে বদ্‌লি হয় তখনই সে অনেক অনুনয় করিয়া বলিয়াছিল, যাস্ ভাই মধ্যে মধ্যে ওখানে—একেবারে নির্বান্ধব দেশে একলাটি থাক্‌তে হবে, বুঝতেই ত' পারিস্।

তাহারপর পত্রের-পর-পত্রে অনুনয়, অনুরোধ, গালি-গালাজ, অনেক কিছুই আসিয়াছে, কিন্তু যাওয়া আর আমাদের ঘটিয়া ওঠে নাই। সে-বছর তাই আমরা মরিয়া হইয়া পূজা কন্‌সেসনে চারখানা টিকিট কাটিয়া ফেলিলাম এবং টাকা-খরচের চাড়ে চাড়ে একদা অপরাহ্নে বাড়ীও ছাড়িলাম।

বিনোদ, হরিশ, সুরেশ ও আমি—দলটি হইয়াছিল জমাট। রাধানাথ ও বিনয় ষষ্ঠীর আগে বাহির হইতে পারিবে না, সুতরাং তাহারা সোজা দিল্লী যাইবে স্থির হইল; আমরা পথে কাশী, প্রয়াগ, লক্ষ্ণৌ, কানপুর ও আগ্রা হইয়া দিল্লী যাইব এইরূপ কথা ছিল।

কায অবশ্য কথামতই হইল। কিন্তু আমরা কখনও ঘরের বাহির হই নাই—অত ট্রেণ ও টাঙ্গার ধাক্কা আমরা সাম্‌লাইতে পারিব কেন? বিশেষতঃ সময় অল্প বলিয়া কোথাও একদিন বিশ্রাম করিতে পারি

নাই। দিল্লীতে যখন আসিয়া পৌছিলাম তখন দেশভ্রমণে আমাদের রীতিমত অরুচি জন্মিয়াছে, তখন শুধু বিশ্রাম করার কথা ছাড়া আর কিছুই ভাবিতে পারিতেছি না। বিনোদ পরিষ্কার বাংলায় সতীশকে বলিয়া দিল, সফ্‌দর্‌জঙ্গ্‌ আমার মাথায় থাকৃল, আমি যে এই ফ্ল্যাট্‌ হলুম, সাতদিনের আগে আর নড়ছি না।

সুরেশ কহিল, বাস্‌রে বাস্‌—নতুন দুজোড়া তাস আনলুম, তা এই ক'দিনে একবারও ছোঁওয়া হ'লনা! তার ওপর আবার তুমি তুল্‌ছ কুতুবের কথা?

বস্তুতঃ আমাদের যতদিনই ছুটি হউক, সমস্ত সময়টা তাস খেলিয়া কাটানোই আমাদের চিরকালের অভ্যাস সুতরাং সুরেশের আক্ষেপটা যে কী পর্য্যন্ত মর্ম্মান্তিক—তাহা সহজেই অনুমেয়।

অতএব বিনয়দের প্রাণে 'শাহী'-দিল্লী দেখিবার বাসনা থাকিলেও আমরা তাহা আমলে আনিলাম না; শুরু হইল সতীশের দৌলতে বিবিধ ছন্দে ভোজন, তাসখেলা আর জমাট আড্ডা!

সতীশের কোয়ার্টারের গায়েই যাঁহাদের বাসা, তাঁহাদের সঙ্গেও শীঘ্রই আলাপ হইয়া গেল, তাঁহারাও সুদূর প্রবাসে সদ্য-দেশ-হইতে-আসা বাঙ্গালীদের পাইয়া আপন করিয়া লইলেন, ফলে সঙ্কীর্ণ সরকারী বাসাবাড়ীর আরও সঙ্কীর্ণ বাহিরের ঘরটি অষ্টপ্রহর জনাকীর্ণ হইয়া থাকিত এবং প্রাণান্ত হইত সতীশের বাড়ীর মেয়েদের—মুহুর্মুহু চা ও পানের ফরমাসে। অবশ্য তাহাতে আমাদের সঙ্কোচের কোনই লক্ষণ দেখা যায় নাই, বরং এখানে আসিয়া এই যে অত্যাচার করিতেছি সে শুধু সতীশকে চরিতার্থ করিবার জন্যই, এই ভাবটাই বরাবর বজায় রাখিয়াছিলাম।

এক কথায়, দিন আমাদের অত্যন্ত আনন্দে ও আরামেই কাটিতেছিল, হয়ত শেষ পর্য্যন্ত কাটিতও, যদি না ঐ অঘটন ঘটিয়া বসিত! কিন্তু কথাটা শুরু হইতেই বলা ভাল।

কেশব ছেলেটি ভাল। লক্ষ্ণৌ আর্ট স্কুলে পড়ে, সম্প্রতি পূজার ছুটিতে দাদার কাছে বেড়াইতে আসিয়াছে। তাহার দাদা নিবারণবাবু পাশের কোয়ার্টারে থাকেন—অত্যন্ত নিরীহ ভালমানুষ। কেশব আমাদের চেয়ে বয়সে অনেক ছোট সুতরাং সে আমাদের অতিশয় সমীহ করিয়াই চলে। তাস খেলার সময় একপাশে চুপ করিয়া থাকে, মধ্যে মধ্যে বিনীত ভাবে দুই-একটা আলোচনা করে। আমরা সকলেই তাহাকে স্নেহের দৃষ্টিতে দেখিতাম।

আমাদের এই প্রথম কলিকাতার বাহিরে আসা, সুতরাং এই কয়দিন পশ্চিমে আসিয়াই এক্কাওয়ালা ও গাইড্‌দের 'জঁহাপনা', 'জনাব', 'জী-হুজুর' প্রভৃতি শুনিয়া মনে মনে উর্দ্দু ভাষা প্রায় আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছি ভাবিয়া অহঙ্কারের আর সীমা ছিল না। তাস খেলিতে বসিয়া পরস্পর উর্দ্দুতেই কথা চলিত, মাস খাইতে বসিয়া মহারাজকে আহার্য্যের ফরমাসও উর্দ্দু ছাড়া করিতে পারিতাম না এমন ভাব দেখাইতে লাগিলাম যে দেশে গিয়াও বাংলায় কথা বলিতে পারিব কি না সন্দেহ।

আমাদের উর্দ্দু-ভাষার উপর অনুরাগ দেখিয়া কেশব সহসা একদিন আমাদের বলিল, উর্দ্দুকে ত' আপনারা প্রায় কায়দা ক'রে এনেছেন, উর্দ্দু গান শুনবেন?

আমরা একেবারে হৈ-হৈ করিয়া উঠিলাম।

নিশ্চয়ই শুনব, কে সে? কি রকম গায়?

কেশব কহিল, বরোদায় থাকেন, মীর মহম্মদ খাঁ। উর্দ্দুতে হাসির গান মোটে ছিলই না, উনিই প্রথম গাইতে শুরু করেন, রচনাও ওঁর নিজের। এখন ওঁর ভারতজোড়া নাম—গাইকোয়াড় মাসে পাঁচশ টাকা সেলামী দেন।

হরিশ একটু সংশয়ের স্বরে কহিল, হাসির গান, সে আবার কি রকম হবে?

আমরা তাহাকে রীতিমত তাড়া দিলাম, হাসির গানই ত ভাল, নইলে সেই তানপুরোর কান মুচড়ে গাঁক গাঁক্ ক'রে চেঁচানো, সেই বুঝি ভাল? আন্‌তে পারবে ত কেশব? কবে আনবে?

কেশব মাথা চুলকাইয়া কহিল, দেখি কথাটা পেড়ে, আস্‌তে আবার রাজী হোলে হয়, শরীর খারাপ—গাইতে মোটে চায়ই না।

আমি কহিলাম, সে হবেনা বাপু, আশা দিয়ে এখন পিছন ফিরলে চলবেনা। যেমন ক'রে হোক্ নিয়ে এস—না হয় কিছু টাকাই দেওয়া যাবে যোগাড় ক'রে।

কেশব একটু আম্‌তা আম্‌তা করিয়া চলিয়া গেল, কিন্তু পরের দিন সকালবেলাই আসিয়া সংবাদ দিল, তিনি আস্‌তে রাজী হয়েছেন, সন্ধ্যেবেলা ঘণ্টা-দুই গাইবেন। মোদ্দা গাড়ীর ব্যবস্থা ক'রে দিতে হবে, এখানে ত' তিনি মোটর আনেন নি!

সুরেশের উৎসাহই সবচেয়ে বেশী, সে ঝাঁ করিয়া পকেট হইতে একখানা পাঁচ টাকার নোট বাহির করিয়া কেশবের হাতে দিয়া কহিল, ভাই তোমার ওপর এই ভারটি রইল, একেবারে যাওয়া-আসার বন্দোবস্তে একখানা ট্যাক্সী নেবে, সন্ধ্যের আগেই তাঁর কাছে গাড়ী নিয়ে চলে যাবে।

কেশব রাজী হইয়া চলিয়া গেল। তাবপর আমরা বেচারী সতীশকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলাম। বাইরের ঘবের জিনিষ বাইরে ফেলতে হবে, বড় দেখে কেটলী আনাও, একটা বড় শতরঞ্জী চাই, কাছাকাছি তানপুরো পাওয়া যাবে ত, পাড়ার লোকজনকে বলতে হবে—এই সব।

সতীশ তাহার ক্ষীণস্বরে বুঝাইবার চেষ্টা করিল যে সমস্ত যোগাড়ই সে করিয়া ফেলিবে, আমাদের সেজন্য কিছুমাত্র চিন্তিত হইবাব কারণ নাই এবং সে শীঘ্রই সব ব্যবস্থা কবিয়াও ফেলিল। এক রায়বাহাদুবেব বাডী হইতে বড় শতবঞ্জী আসিল, কোন্ যতীনবাবু একটি কেটলী দিলেন, আরও কোথা হইতে ট্রে আসিল, এক কথায় আযোজনেব কোনও ক্রুটি ঘটিল না। বাহিবেব ঘবেব জিনিষ-পত্র সবাইযা ঢালা ফবাশ বিছানো হইল—বাত্রে আমাদেব ও পাড়ার জনকয়েকের জন্য বিশেষ ভোজনের ব্যবস্থাও করা হইল; আমরা শুধু সারাদিন হৈ-হৈ কবিলাম। এত উৎসাহ যে, মধ্যাহ্ন ভোজনে কাহারও ভাল মন গেলনা এবং সেজন্য সতীশেব বাড়ীর মেযেদের আরও বার-দুই চা কবিতে হইল এবং একশ' বেশী পান সাজিতে হইল।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে হইতেই প্রতিবেশী ভদ্রলোকগুলি একে-একে আসিয়া জমিতে লাগিলেন, দেখিতে দেখিতে ঘর প্রায় ভরিয়া উঠিল। সিগারেটের ধোঁয়া ও স্ফূর্ত্তি-মিশ্রিত তাম্বূলের সৌরভে ঘরের বাতাস ঘন হইয়া উঠিল, যেন নিঃশ্বাস লইতে কষ্ট হয়।

কিন্তু তখনও কেশবের দেখা নাই। আমরা সঙ্গীতের উপক্রমণিকা স্বরূপ—খেয়াল, ধ্রুপদ প্রভৃতি সঙ্গীতের কথা উর্দ্দুতে আলোচনা করিতে শুরু করিলাম। আলোচনা প্রায় জমিয়া আসিয়াছে এমন সময় কেশব আসিয়া উপস্থিত হইল, খাঁ-সাহেব আসিয়াছেন।

হাঁ—ওস্তাদের মত চেহারা বটে! দীর্ঘ গৌর বর্ণ দেহ, গম্ভীর মুখ, গোঁফদাড়িতে প্রায় পাক ধরিয়াছে। আমরা সকলে একসঙ্গে অভ্যর্থনা করিতে চেষ্টা করিলাম। পান কৈ, চা কৈ—আর একদফা হৈ-হৈ পড়িয়া গেল।

খাঁ-সাহেবের সঙ্গে আসিয়াছেন তাঁহার তবল্‌চি; বাঁয়া তবলা, তানপুরাও নিজে সঙ্গে করিয়াই আনিয়াছেন। তিনি আমাদের অভ্যর্থনার উত্তরে খুব সংক্ষেপে দুই-একটি কথায় বিনয় প্রকাশ করিলেন, তারপর চা ও গোটা-দুই সিগারেট সেবনের পর তানপুরা ও তবলা বাঁধিতে বলিলেন।

তানপুরা বাঁধিতে অত্যন্ত সময় লাগিল; ইতিমধ্যে কেশব আমাদের সবাইকে নিম্নস্বরে বলিয়া দিল যে, খাঁ-সাহেব যখন গান গাহিবেন তখন তাঁহার মুখ দেখিয়া মনে হইবে যে তিনি অতিশয় গম্ভীর কিছু গাহিতেছেন কিন্তু আসলে আমাদের হাসিতে-হাসিতে পেট ছিঁড়িয়া যাইবার উপক্রম হইবে—এমনিই তাঁহার ক্ষমতা!

শুনিয়া আমাদের উৎসাহ আরও বাড়িয়া গেল, অথচ তাঁহার তানপুরা আর বাঁধা হয় না; যাহা হউক্ পুরা অর্দ্ধঘণ্টা পার করিয়া তিনি গান ধরিলেন।

কিন্তু এ কি?

কী ভাষায় গাহিতেছেন তিনি? প্রথমটা মনে হইল যে কোনও বিজাতীয় ভাষা হইবে। তারপর আরও একটু চেষ্টা করিয়া বুঝিলাম ভাষাটা উর্দ্দূই বটে, তবে, তাহা আমাদের আয়ত্তের বাহিরে। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পরস্পরের মুখের দিকে চাহিতে লাগিলাম। কিন্তু তাহাতে বিশেষ সুবিধা হইল না, কারণ সকলেরই সমান অবস্থা।

ঐ দলের মধ্যে আমারই মাথা একটু সাফ্ ছিল, (আপনারা হয়ত বিশ্বাস করিবেন না) চট্ করিয়া একটা বুদ্ধি খেলিয়া গেল। কেশব বসিয়াছিল খাঁ সাহেবের ঠিক্ পিছনে, আমি এমন ভাবে সরিয়া বসিলাম যাহাতে কেশবের মুখটা পরিষ্কার দেখা যায়—তারপর প্রাণপণে তাহাকে অনুকরণ করিতে শুরু করিলাম।

কেশব তখন মুখে রুমাল চাপা দিয়া হাসি চাপিবার চেষ্টা করিতেছে, আমি মুখে কোঁচা চাপা দিলাম। তখন ঘরের অন্য সকলে যেন একটা হদিশ পাইল, তাহারা আমার অনুকরণে হাসিতে সুরু করিল।

কিন্তু কি জানি কেন খাঁ-সাহেবের মুখ যেন সহসা অন্ধকার হইয়া উঠিল। আমি একটু দমিয়া গিয়া কেশবের দিকে চাহিলাম, দেখি সে উপুড় হইয়া পড়িয়া হাসিতেছে। তখন আমিও যথাসাধ্য হাসিতে লাগিলাম।

তারপর এই ব্যাপারই চলিল। মাঝে মাঝে কেশব হাসিটা একটু সম্বরণ করে, আমরাও তখন মৃদু-মৃদু হাসিতে থাকি, যখন সে বেশী হাসে আমরাও তখন হাসিয়া লুটাইয়া পড়ি।

খাঁ-সাহেবের মুখে কিন্তু ভ্রূকুটি লাগিয়াই রহিল, বরং তাহা ক্রমশঃ ভীষণ রূপ ধারণ করিল। আমার মনে একটা খট্‌কা লাগিলেও ভাবিলাম, কেশব যখন নিশ্চিন্ত আছে তখন ভয়ের কোন কারণ নাই।

অবশেষে গান থামিল। কিন্তু গান শেষ করিয়াই খাঁ-সাহেব আষাঢ়ের মেঘের মত মুখ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

আমরা সব হৈ-হৈ করিয়া উঠিলাম, এ কি খাঁ-সাহেব চল্‌লেন কোথায় ?

খাঁ-সাহেব তবল্‌চিকে উঠিতে ইঙ্গিত করিয়া যাহা কহিলেন তাহার



যথন সে বেশী হাসে আমরাও তথন হাসিয়া লুটাইয়া পড়ি।

মর্ম্মার্থ এই যে, তিনি গত চব্বিশ বছর যাবৎ গান গাহিতেছেন, অনেক বাদশাহের আসরেও গাহিয়াছেন কিন্তু তাঁহাকে এত অপমান করিতে কেহ কখনও সাহস করে নাই।

আমাদের সম্মুখে যেন বজ্রাঘাত হইল! কোনও রকমে শুষ্ককণ্ঠে হরেন্দ্র কহিল, সে কি কথা খাঁ-সাহেব, আমরা আপনার অপমান করতে সাহস করব? আমাদের কি গোস্তাকী হ'ল দয়া ক'রে যদি ভেঙে বলেন—

খাঁ-সাহেবের চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল; কহিলেন, মহামান্যা জায়ব-উন্নিসা বেগমের লেখা শোক-সঙ্গীত খাঁটি রাগিণীতে গাইছি আব আপনাবা হাসছেন? জানেন বরোদার মহারাণী শুনে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছিলেন?·········আমার খুব শিক্ষা হ'ল, আর কখনও বাঙ্গালীর সাম্‌নে গাইব না।

আমরা সকলেই একযোগে কেশবের দিকে চাহিলাম কিন্তু কোথায় সে? ইতিমধ্যে যেন সে উপিয়া গিয়াছে, কোথাও তাহার চিহ্ন নাই। খাঁ-সাহেব চলিয়া গেলেন, আমরা একটা ক্ষমা প্রার্থনা পর্যান্ত করিতে পারিলাম না।······

তাহার পরের কথা আর বিস্তারিত করিয়া বলিবার মত নয়। এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে সে-রাত্রে আমরা আর কেহ একটি কথাও কহি নাই। প্রতিবেশীরা না খাইয়া চলিয়া গেলেন, আমরাও কেহ ভোজন করিতে পারিলাম না; আহার্য্য নষ্ট হইল। এবং পরের দিনই জিনিষপত্র বাঁধিয়া আমরা তুফান মেলে রওনা হইলাম, সোজা বাড়ীর দিকে।

সতীশ থাকিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিল না, শুধু স্টেশনে আসিয়া আমাদের তুলিয়া দিয়া গেল। তাহার অবস্থা আরও খারাপ; এবং মুখ দেখিয়া বোঝা গেল যে, সে-কথা সে বুঝিতে পারিয়াছে; কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমবা কোনও প্রকার সান্ত্বনার কথা কহিতে পারিলাম না।···

তারপর আর কখনও দিল্লী যাই নাই।*

* বিলাতী গল্পের আভাসের উপর রচিত।

লটারির টাকা

দুটি কান এবং নাক পর্য্যন্ত গায়ের কাপড়ে ঢাকিয়া, কোন মতে বাঁ হাতে মাছের ফলুইটা একটু তফাৎ রাখিয়া শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে তারাপদ বাজারে যাইতেছিল। কিন্তু বাগানের সীমা পার হইয়া পাকা রাস্তায় পড়িবার মুখেই রাধেশবাবু সহসা পিছু ডাকিলেন, বলি ও তারাপদ, সংবাদ যা শুন্‌ছি তা কি সত্য ?

সংবাদটা যে কি তাহা তারাপদ জানিত, কারণ পূর্ব্বদিন রাত্রে সে-ও সংবাদ পাইয়াছে ; সুতরাং বিস্ময় প্রকাশ না করিয়া কিংবা পিছন না ফিরিয়াই বিরস কণ্ঠে সে প্রশ্ন করিল, সংবাদটা কি ?

রাধেশ বিস্মিতকণ্ঠে কহিলেন, শোননি, তুমি ? কালিপদ তোমাকে চিঠি দেয়নি ? গাঙ্গুলী খুড়ো, নন্দ সরকার সব্বাই নাকি চিঠি পেয়েছে আর তুমি এখনও খবর পাওনি ?

বিরক্ত কণ্ঠে তারাপদ জবাব দিল, খবরটা কি না জানলে কেমন করে বলব যে শুনেছি কি না, চিঠি ত আমার কাছে ফি হপ্তাতেই আসে—

রাধেশ তারাপদকে ধরিবার জন্য অনেকটা পথ দ্রুত হাঁটিয়া আসিয়া তখনও হাঁপাইতেছিলেন, খানিকটা দম লইয়া কহিলেন, লটারীর খবর, আর কি ! কালিপদ রেঞ্জার্সের ফার্স্ট প্রাইজে সাড়ে-ছত্রিশ হাজার টাকা পেয়েছে।

তারাপদ যেন তাচ্ছিল্যভরে ঘাড়টা ঘুরাইয়া লইয়া পথ চলিতে শুরু করিয়া কহিল, হুঁ !



বলি ও তারাপদ, সংবাদ যা শুনছি তা কি সত্য?

রাধেশবাবু ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, হুঁ, কিগো? পেয়েছে হুঁ, না খবরটা পেয়েছ তাই?···না কি শোননি কিছু?

তারাপদ এবার মুখের উপর হইতে গাত্রবস্ত্রটা সরাইয়া বেশ ঝাঁঝের সহিতই জবাব দিল, পরের খবরের জন্য অত মাথা ব্যথা কেন রাধেশ দা? টাকা পেলে কি তোমার কিছু সুবিধে হবে বলতে পারো? সে

পেলে কি না পেলে তাতে তোমার আমার এল গেল কি ?···আমিও একখানা চিঠি পেয়েছি ঐ পর্য্যন্ত, কিন্তু কৈ, তা নিয়ে ত তোমার মত ভোরবেলাতেই ছুটোছুটি শুরু করিনি !

পুনরায় সে বাজারের পথ ধরিল। রাধেশবাবু কিছুক্ষণ হতভম্বের মত সেইখানে দাঁড়াইয়া থাকিয়া কতকটা আপন মনেই কহিলেন, বাব্বা ঝাঁজ দেখেছ ! হিংসে !

কালিপদ তারাপদর মায়ের পেটের বড় ভাই, বি-এ পাশ করিয়াছে, কলিকাতায় থাকিয়া মোটা মাহিনার সরকারী চাকুরী করে ! তারাপদ বাল্যকালে লেখাপড়া শিখিবার সার্থকতা কি বুঝিতে পারে নাই, যখন পারিল তখন আর নূতন করিয়া শুরু করিবার বয়স নাই। সুতরাং তাহাকে দেশেতেই পড়িয়া থাকিতে হইয়াছে। দেশে যা জমি-জমা ছিল তাহার মধ্য হইতে কালিপদ কোনরূপ উপসত্বই দাবী করে না বলিয়া তারাপদর স্বচ্ছন্দেই চলে। উপরন্তু পূজার পূর্ব্বে ও চৈত্রমাসে যখন নগদ খরচা বেশী, কালিপদ বরাবর একশত করিয়া টাকা তাহাকে পাঠায়। মধ্যে মধ্যে যখন সে পুত্রকন্যা লইয়া বাড়ী আসে তখন তাহার ছেলেমেয়ের জন্য কাপড়-জামা ও অন্যান্য জিনিষ আনিতেও কখনও ভুল হয় না। তবুও তাহার বি-এ পাশের এবং কলিকাতায় থাকিয়া মোটা মাহিনার চাকুরীর অপরাধ তারাপদ কখনও ক্ষমা করে নাই !

গতকল্য অপরাহ্ণে চিঠিটা পড়িয়া কথাটা ভাল করিয়া বুঝিতে তাহার সময় লাগিয়াছিল। কিন্তু দাদাকে সে চিনিত, বহুবার চিঠিটা পড়িবার পর কথাটা তাহাকে বিশ্বাস করিতেই হইল। সেই হইতে তাহার যে কি ভাবে সময় কাটিয়াছে তাহা একমাত্র সে-ই জানে। রাত্রে কিছু খায় নাই এবং সারারাত্রি ঘুমাইতে পারে

নাই। স্ত্রী তবু দুই-একবার বিধাতার অবিচারে ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছে, বিলাপ করিয়াছে, শেষ পর্য্যন্ত তাহার ছেলেমেয়েদের কিছু পাইবার সম্ভাবনা আছে এই আশায় মনকে সান্ত্বনা দিয়াছে কিন্তু তারাপদ একটি শব্দও মুখে উচ্চারণ করে নাই—বিধাতার এই সুকঠিন আঘাতে সে যেন পাষাণে পরিণত হইয়া গিয়াছিল।

টিকিট সে-ও কিনিযাছিল, দাদা বৌদিব নাম নম-ডি-প্লুম দিয়াছিলেন, সেও নিজের স্ত্রীর নাম দিয়াছে, অথচ—

কথাটা জোব করিয়া ভুলিবার জন্যই সে অত ভোরে বাজারে বাহিব হইযাছিল কিন্তু বাধেশবাবুর কথাগুলিতে সমস্ত জ্বালা যেন নূতন করিয়া তাহার বুকের মধ্যে জ্বলিয়া উঠিল।

বড় বাস্তাটাকে পরিহার কবিবার জন্য যদু বৈরাগীর বাগানেব পাশ দিযা সে মাঠের রাস্তা ধরিল, না হয কিছু ঘুরিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু বিধাতা বাম, নন্দ সরকারও কি একটা কাজে মাঠের বাস্তা ধরিয়া সেই দিকেই আসিতেছিলেন। কুয়াশাতে দৃষ্টি কিছুদূর পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন হইয়াছিল বলিয়া তারাপদ যখন তাহাকে চিনিতে পারিল তখন আব ফিবিবাব পথ নাই।

নন্দ কহিল, কি বাবা, সন্দেশ খাওযাবার ভয়ে এত পথ ঘুরে বাজারে চলেছ? ওসব শুনছি না, গরম ছানার জিলিপি অন্তত সেরটাক খাওয়াতে হবে!

তারাপদ কিছু পূর্ব্বে মেজাজ দেখাইয়া মনে মনে একটু লজ্জিত ছিল, সে এবার অতি কষ্টে চিত্তদমন করিল; শান্ত কণ্ঠেই কহিল, জিলিপিটা বড় কথা নয়, কিন্তু কারণটা জানতে পারি কি?

নন্দ যেন থতমত খাইয়া গেল, কহিল, তার মানে ? সংবাদ পাওনি তুমি ?

তারাপদ তেমনি প্রশান্ত কণ্ঠে কহিল, কিসের সংবাদ, দাদা লটারীতে টাকা পেয়েছে তাই ?

নন্দ জবাব দিল, সেইটেই কি সোজা খবর হ'ল ?

তারাপদ সামান্য একটু বিদ্রূপের স্বরে কহিল, না সোজা হ'ত না, যদি টাকাটা হা'তের কাছে পাওয়া যেত ! কিম্বা, যদি পেতে দেখতে কাউকে।

নন্দ কহিল, কি রকম কথাটা হ'ল ? দাদা তোমার টাকা পায়নি ?

তারাপদ কহিল, তুমি পেতে দেখেছ ?

নন্দ কহিল, পেতে আবার কে দেখে !

তারাপদ এবার সামান্য রকমের কঠিনকণ্ঠে কহিল, তবে খামকা লাফালাফি করছ কেন ? কাকে কান নিয়ে গেল শুনেই যে কাকের পেছনে দৌড়লে !

এই বলিযা সে সহসা অনাবশ্যক দ্রুত বেগে পা চালাইল। নন্দ পিছনে কি একটা বলিবার চেষ্টা করিতেছে শুনিয়াও ফিরিয়া দাঁড়াইল না। কিন্তু সেদিন এমনিই দুরদৃষ্ট যে দুই-পা যাইতে না যাইতে আবার ষষ্ঠীচরণের প্রবেশ !

ষষ্ঠী কহিল, কি হে অর্দ্ধ-লক্ষেশ্বরের ভাই ! কোথায় চললে ?

তারাপদ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে এবার আর থামিবে না, সে চলিতে চলিতেই জবাব দিল, সম্প্রতি অর্দ্ধ পয়সার চিংড়ি মাছের সন্ধানে !

কিন্তু ষষ্ঠী ছাড়িবার পাত্র নয়, সে খপ্ করিয়া তাহার গায়ের

কাপড়টা টানিয়া ধরিয়া কহিল, আরে অত মেজাজ কেন! না হয় ভাই প্রায় আধলাখ টাকাই পেয়েছে, তাই ব'লে কি দাঁড়িয়ে দুটো কথা বললেও দোষ হয়?

তারাপদ দাঁড়াইল—

ষষ্ঠীচরণের চোখের দিকে স্থির দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিল, কাল রাতে ঘুম হয়েছিল ত। আধলাখের হিংসেতে ঘুমোতে পেরেছিলে!

ষষ্ঠীচরণ একটু অপ্রতিভ হইয়া কহিল, হিংসে হবে কেন ভাই, এ ত আনন্দের কথা!

তারাপদ শুধু জবাব দিল, হুঁ, তাইত দেখছি।

তাহার পর স্তম্ভিত ষষ্ঠীচরণের দিকে দৃক্‌পাত মাত্র না করিয়া পুনশ্চ পথ চলিতে লাগিল।

বাজারের প্রবেশ-পথে বোধ করি সকলে সমবেত হইয়া ঐ কথাই আলোচনা করিতেছিলেন, তারাপদকে দেখিয়া কোলাহল করিয়া উঠিলেন। গাঙ্গুলী খুড়ো মোটামানুষ, কোন রকমে ভিড় ঠেলিয়া সাম্‌নে আসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিলেন, ও সব শুন্‌ছিনে তারাপদ, বেশ ভাল ক'রে একদিন সবাইকে খাওয়াতে হবে! আমি কালিকেও তাই লিখে দিলুম।

তারাপদ ততক্ষণে মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে, সে স্থির হইয়াই দাঁড়াইল; কহিল, খাবেন আপনারা, সে ত আমার ভাগ্যের কথা, জমি-জমা বেচেও খাওয়াতে হবে কিন্তু কারণটা কি ঘট্‌ল শুন্‌তে পাইনা।

গাঙ্গুলী খুড়ো কহিলেন, তার মানে? কালিপদর লটারিতে টাকা উঠেছে যে—তোমায় লেখেনি?

তারাপদ হাসিয়া কহিল, আমার বাবাও আপনাকে খুড়ো বলতেন,

সে হিসেবে আপনি আমাদের ঠাকুর্দ্দা হলেন, সম্পর্কটা ঠাট্টা করার, তা ভুলে যাচ্ছেন কেন ?

সহসা সমস্ত কোলাহল যেন নিমেষে স্তব্ধ হইয়া গেল। কিন্তু তাহা ক্ষণকালের জন্য, পরক্ষণেই একযোগে সহস্র প্রশ্ন। গাঙ্গুলী বলিলেন, শুধু ত আমাকে নয়, নন্দকেও লিখেছে—

তারাপদ সামান্য একটু বিদ্রূপের স্বরে কহিল, নন্দ ত দাদার সম্পর্কে শালা। আর কাকে লিখেছে শুনি !

তখন কিছুক্ষণ ধরিয়া সকলেই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিলেন। সত্যই কালিপদ আর কাহাকেও লেখে নাই। সুরেন উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল, কিন্তু আমি কাগজ দেখেছি। যে ঘোড়া ফার্স্ট হ'ল, তার একটা নম-ডি-প্লুম ছিল 'সুহাসিনী' !

তারাপদ জবাব দিল, বৌদির নাম—এইত ?···কিন্তু সুরেন, যদি একটু খোঁজ ক'রে দেখ ত দেখবে আমাদেব গাঁয়েই অন্ততঃ ত্রিশটে সুহাসিনী আছে। আচ্ছা, আমি এগুই, তাড়া আছে।

উপস্থিত সকলে বিস্ময়ের বেগটা সামলাইবার পূর্ব্বেই দেখা গেল তারাপদ অন্তর্হিত হইয়াছে। তখন রীতিমত আলোচনা করিবাব পর সকলকেই স্বীকার করিতে হইল যে কালিপদ টাকাটা পাইয়াছে কিম্বা নিশ্চিত ভাবে পায় নাই, কথাটা কিছুতেই স্থির রকম বোঝা গেল না।

ফলে ব্যাপারটা সারাদিন ধরিয়াই লোকের মুখে মুখে ঘুরিতে লাগিল। পরিচিত লোক খামকা কতকগুলি টাকা পাইলে কেহই খুশী হয় না, সুতরাং সন্ধ্যার দিকে কালিপদর টাকা পাওয়ার কথাটা সম্পূর্ণ পরিহাস, এই দিকেই লোকের প্রত্যয় বেশী ঝুঁকিয়া পড়িল। অথচ ব্যাপারটার মীমাংসাও করা যায় না, কারণ যতবারই লোকে

তারাপদর খোঁজ করিতে যায় ততবারই তাহার কন্যা বাহির হইয়া বলে, বাবা বাড়ী নেই।

কথাটা বলিয়া ফেলিয়া বাজারের মধ্যে ঢুকিয়াই তারাপদ একটা নিষ্ঠুর আনন্দ উপভোগ করিল। কাল সারা রাত মনের যে অসহ্য গুমোটে সে ঘুমাইতে পারে নাই, আজ তাহারই মধ্যে যেন প্রথম শরতের লঘু বাতাস একটু ভাসিয়া আসিল। সে উৎসাহের সহিত দ্রুত বাজার করিল এবং প্রাণপণ চেষ্টায় পরিচিত দৃষ্টি এড়াইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিল। কথাটা অস্বীকার করিতে পারিলে জ্বালা কতকটা সে জুড়াইতে পারিত, কিন্তু দাদার উপর এতটুকু ভরসা নাই, হয়ত পুত্র-কন্যা লইয়া উৎসব করার জন্য কালই আসিয়া হাজির হইবে। সুতরাং সে সেই দিনই দাদাকে আনন্দ জানাইয়া, গ্রামে অত্যন্ত অসুখ-বিসুখ করিতেছে তাহারই মিথ্যা একটা সংবাদ দিয়া ডাকে পাঠাইয়া দিল এবং উত্তরটা না আসা পর্য্যন্ত ঘরের মধ্যেই গা-ঢাকা দিয়া রহিল।

অবশেষে দাদার উত্তর আসিল। তিনি লিখিয়াছেন, 'আমার যাইবার খুবই ইচ্ছা ছিল কিন্তু তোমার পত্রে অসুখ বিসুখের কথা শুনিয়া আর ভরসা হইল না। টাকাটা পূজার সময় পাওয়া যায়—সেই সময় দেশে গিয়া একটু আমোদ-আহ্লাদ করা যাইবে।'

সেই দিনই অপরাহ্ণে তারাপদ পাড়ায় বাহির হইল এবং মেয়েকে দিয়া পরের দিন সকালে জনকয়েককে চা খাইবার নিমন্ত্রণ জানাইয়া আসিল। বলা বাহুল্য, সকলেই একযোগে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রশ্ন সেই একই—দাদা টাকাটা পাঠাইয়াছেন কিনা।

তারাপদ একটু উঁচুদরের হাসি হাসিয়া কহিল, দাদাও টিকিট কিনেছিলেন বটে, নম-ডি-প্লুমও ঐ, তবে তাঁর নম্বর ওঠেনি। দাদার

স্বভাব ত জানই নন্দ, ব্যাপারটা নিয়ে একটু তামাসা করার লোভ আর সামলাতে পারলেন না !···আসুন গাঙ্গুলী খুড়ো, তামাক খান !

মৌখিক হতাশা ও আন্তরিক আনন্দমিশ্রিত একটা ধ্বনি প্রায় সকলেরই মুখে। তারপর নানা প্রশ্ন ! নানা কথার পর কথাটা আবার ঘুরিয়া আসিল সেই কালিপদরই সাংসারিক অবস্থায়। তারাপদ কিছুক্ষণ বাহিরের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, টাকাটা পেলে দাদার ভালই হ'ত! মোটা মাইনে পান্ বটে, কিন্তু বৌদিটিও ত আমার কম কাপ্তেন নন্—কিছুই আর থাকে না ! উল্‌টে দেনা মাথায়। এইত সেবার নালিশ হ'তে হ'তে বেঁচে গেল, আমি এখান থেকে টাকা পাঠাই তবে রক্ষা ! মেয়েটার বিয়ের জন্য যে কটি টাকা রেখেছিলুম বাঁচিয়ে—এক কথায় বেরিয়ে গেল। কি করি বলুন, নিজের ভাই ত !

—বল কি তারাপদ, এমন অবস্থা ?

তারাপদ আবার হাসিল, কহিল, সরকারী চাকরী কি আর আমিই পেতুম না। আমার মামাশ্বশুর হলেন সার্ভে অফিসের বড়বাবুর পার্সোনাল এ্যাসিস্‌ট্যান্ট। কিন্তু ভেবে দেখলুম যে ঐ ত অবস্থা, তার চেয়ে গাঁয়ে বাস ক'রে জমি-জমা দেখাও ভাল।···বুঝলে ষষ্ঠীচরণ, চাক্‌রী করনি ভালই করেছ, নুনভাত খাচ্ছ বটে কিন্তু দেনা ত নেই।

কথাবার্ত্তা এই পথেই অগ্রসর হইতেছে এমন সময় ডাকহরকরা একটি চিঠি দিয়া গেল। কালিপদর হস্তাক্ষর দেখিয়া নিমেষের জন্য তারাপদর মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু সে গম্ভীর মুখেই চিঠিটা পড়িল। চিঠিতে লেখা ছিল, 'আমার সম্বন্ধীর মুখে শুনিলাম আনন্দপুরের রহিম শেখের সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় হইবে। যতদূর অনুমান হয় হাজার তিনেকের বেশী দাম হইবে না। তোমার বৌদিদির ইচ্ছা, ঐ সম্পত্তি

বৌমাব নামে খবিদ কবা হয়—তোমার মেয়েবা বড় হইতেছে, আয বাড়ানো আবশ্যক। সুতবাং আগামী ববিবার আমি একাই ওখানে যাইব। রহিম শেখের কাগজপত্রগুলিও দেখা হইবে এবং তোমাদের সঙ্গে দেখা কবাব কাজও মিটিবে। ইতি'

তাবাপদ চিঠিটা পড়িযাই কোন কথা না বলিযা ভিতবে চলিয়া গেল। তাহাব পব বহুক্ষণ দেখা নাই। নন্দ সভযে বলিল, কোনও খাবাপ খবব এল নাকি খুড়ো?

বিজয কহিল, তাইত, মুখটা যেন সাদা হযে উঠল পডতে পডতে।

গাঙ্গুলী কহিলেন, আমবা না হয উঠি—

ষষ্ঠী বলিল, সেটাও ভাল দেখায না।

কিন্তু কিছুই কবিতে হইল না, প্রায আধঘণ্টা পবে তাবাপদ ঘবে ঢুকিল, পিছনে মেযেব হাতে একটা বড খালায একথালা ছানাব জিলাপী! সে হাসিয়া কহিল, মিষ্টিমুখটা কবাবাব আগে শুভ সংবাদটা নিশ্চিত ক'বে জানাবে না ব'লে এত কাণ্ড।···দাদাও ববিবাব আসছেন, সেদিন একটু আমোদ-আহ্লাদ কবা যাবে।

শেষ